ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি।

অর্থাৎ

পুরাকালে যে সমস্ত ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণ উচ্চধরণের কবিত্বশক্তি লইয়া এতদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

প্রথম ভাগ।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১৬ নম্বর ছকুখানসামার লেন, রাধারমণ যন্ত্রে

শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮১৫।

ভূমিকা।

ভারতবর্ষীয় ভক্তকবির প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। অস্মদ্দেশীয় যে সকল অগণ্য ধর্ম্মবীর সাধুগণ সুমধুর কবিতা ও "ভজন" আদি রচনা করিয়া, স্বীয় স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী একত্রে প্রকাশ করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য যে, এতদ্দ্বারা ভক্ত কবি-কুলের বিস্তারিত জীবন-চরিত প্রণয়ন করা আমার অভিপ্রেত নহে। কেবল প্রত্যেক মহাত্মার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের মধ্যে কে কোন ধরণের লোক ছিলেন ও কাহাদ্বারা জগতের কি পরিমাণে উপকার সংসাধিত হইয়াছে, তাহারই সামান্যভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

উপস্থিত খণ্ডে চারিজন মাত্র মহাপুরুষের জীবনী প্রদত্ত হইল, যথা—(১) কবীরদাস, (২) নানকশাহ, (৩) তুলসীদাস, (৪) তুকারাম। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশের কতি-পয় বৎসরের মধ্যে, এই কয়েকজন মহাত্মা প্রাদুর্ভূত হন। ইহাঁ-দের মধ্যে কাহারও রীতিমত জীবন-চরিত, বোধ হয়, অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। কেবল মাত্র নানকের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

তুকারাম দাক্ষিণাত্যের লোক। বঙ্গদেশ তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্রের অতীত-ভূমি। এদেশের অনেক লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। এদিকে, মহারাষ্ট্রীয় ভিন্ন অন্য

[illegible]

কোনও দেশীয় ভাষায় বা ইংরাজীতে লিখিত তাঁহার জীবনের কোনও ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ-ভারত হইতে প্রত্যাগত কতিপয় বন্ধুর নিকট শ্রুত বিবরণ, তুকারামের কএকটী আভাঙ্গার আশয় ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত দুই একটী বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই মহাত্মার জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে। এই গুলির মধ্যে "ন্যাসানল ম্যাগাজিন" নামক পত্রে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত, ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে, এরূপ জীবন-চরিত পাঠে লোকের কতদূর কৌতূহল নিবারণ হয় ও উপকার দর্শে, বলিতে পারা যায় না। তবে যদি প্রথম খণ্ডের প্রতি পাঠকমণ্ডলীর কিছুমাত্র অনুগ্রহ দেখিতে পাই, তাহা হইলে, দ্বিতীয় খণ্ডে, বঙ্গীয় ভক্তকবি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব ও রামপ্রসাদের এইরূপ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইব। ইতি।

পুরুলিয়া।
১৮ই শ্রাবণ, ১৮১৫ শকাব্দা। } শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা

১ম পৃষ্ঠা ৭ম পংক্তিতে "নিষ্কাষণ" স্থলে নিষ্কাশন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি।

প্রথম ভাগ।

কবীর-দাস।

ভারতবর্ষীয় ভক্ত কবিদিগের প্রকৃত জীবন চরিত সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও বলা যাইতে পারে। এমন কি, যে সকল মহাত্মার প্রতিভা বলে এক সময় সমুদায় দেশ বিপ্লাবিত হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবের কাল পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত করা দুরূহ। ইহার উপর, আবার সমস্ত ঘটনাস্রোত এতাধিক অসম্ভব ও অলীক বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বৈষ্ণব চূড়ামণি নাভাজী প্রণীত ভক্তমাল গ্রন্থেই কেবল এই জাতীয় মহাপুরুষগণের জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তন্মধ্যে অধুনাতন জীবন চরিতের উপাদান নিতান্তই অল্প পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল অলৌকিক আখ্যায়িকা সমূহের বহুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। কবীর পন্থী সাধুদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদাদি, ভক্তমাল, বীজক, সুখনিদান প্রভৃতি গ্রন্থ এবং আধুনিক অসম্পূর্ণ

আকারের দুই একটী সন্দর্ভ অবলম্বন করিয়া মহাত্মা কবীরের পশ্চাল্লিখিত জীবনচরিত বিরচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভক্তমাল ও "ইণ্ডিয়ান ব্যাপটীষ্ট" অভিহিত সাময়িক পত্রে প্রেমচাঁদ নামক জনৈক লেখকের প্রসঙ্গ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অলৌকিক আখ্যায়িকার মধ্যে উপদেশপূর্ণ ও অন্তঃসার বিশিষ্ট কএকটী গল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জাতীয় বর্ণনা এককালে পরিত্যাগ করিলে এতাদৃশ লোকের জীবনীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও চমৎকারিত্ব অনেকটা কমিয়া যায়। এই হেতু ঐ গুলি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ উপাখ্যান গুলিতে বর্ণিত ব্যাপার সমূহের ঐতিহাসিক মূল্য অল্প হইলেও, উহা হইতে উচ্চদরের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বারাণসীর নিকটস্থ কোন ও ক্ষুদ্র গ্রামে, মহাত্মা কবীর দাস জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভারতীয় ভক্ত কবিকুলের শিরোভূষণ ছিলেন, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাঁর ধর্ম্মমত অতীব উদার ও অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মহাপুরুষ একাধারে অতি উচ্চ দরের ভক্ত, ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইলে, যখন হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণ-দিগের আধিপত্য নিরতিশয় পরিবর্দ্ধিত ও পৌত্তলিকতার স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। উপধর্ম্মের প্রভাব চতু-র্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে ভ্রম, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার মেঘে ভারতীয় আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। নানাবিধ অলীক গল্প,

অলৌকিক বর্ণনা ও অসার উপন্যাস এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রহেলিকার সংমিশ্রণে পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের বিষম বিকৃতি সংঘটিত হয়। এই বিকৃতাবস্থা বহুদিন পর্য্যন্ত রহিয়া যায়। এমন কি, অদ্যাপিও ইহার মহতী-শক্তি দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে এবং এতদ্বারা এখানকার রাজনৈতিক, ধর্ম্ম-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতির এই একটী সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংসার মধ্যে কোনও অমঙ্গল বা অভাবের আতিশয্য হইলে, উহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ঈশ্বরের নিয়ম সমূহ সমতার পক্ষপাতী। যে দেশে লোক সংখ্যা কম, দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে; যেখানে উহার বিসদৃশ উপচয়, সেখান হইতে কতক-লোকের অন্যত্র চলিয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, অথবা দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক রোগ বা অন্য কোনও দৈবকৃত উৎপাতে প্রজাক্ষয় হইয়া সাম্য আনয়ন করে। অধিক গ্রীষ্মের পর বর্ষা, অন্ধকারের পর আলোক, দুঃখের পর সুখ, জগতের দৈনন্দিন ব্যাপার। পৃথিবী যৎকালে পাপভারাক্রান্ত হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর মনুষ্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া লোক সমূহকে উদ্ধার করেন, এরূপ সংস্কার অনেক সভ্যজাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার, যখন লোক সমাজ কুসংস্কার ও ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তৎকালে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য ধর্ম্ম সংস্কারক মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধানের পর, ভারত-বর্ষে যে উপধর্ম্মের বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, তাহার অন্ধকার ভেদ করিয়া সত্যের জ্যোতি বিস্তার করিবার জন্য এইরূপ অনেকানেক মহা-

পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত করিতেছেন, এবং যত দিন না ভ্রম প্রমাদ ও কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়া জন সমাজ পবিত্র ধর্ম্মালোকে আলোকিত হয়, ততদিন করিতে থাকিবেন। সাধারণ 'প্রয়োজন ও পরিপূরণে'র নিয়মানুযায়ী ইহা অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে কবীর-দাস একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। জাতিভেদ বিনাশ করিয়া উদারভাবে এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের আরাধনা প্রচলিত করাই এই মহাত্মার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

কবীরপন্থীদিগের মুখে একটী দোহা শুনিতে পাওয়া যায় যদ্দ্বারা প্রকাশ পায় যে, কবীর দাস ১২০৫ সম্বতে অর্থাৎ ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে, কাশী নগরে অবস্থান করিতেন। আবার, ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মগর নামক গ্রামে গমন করেন ও তথায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে দেহ লীলা সম্বরণ করেন। এই দুইটী কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে, ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কবীর ৩০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার মতাবলম্বীরা তাঁহার তিন শত বৎসর জীবিত থাকিবার কথাই বিশ্বাস করেন। ইতিহাসের আলোকে বিচার করিতে গেলে, কিন্তু এই দুইটী সময়ের কোনওটীকেই কবীরের জীবিত থাকিবার কাল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব চূড়ামণি নাভাজীর লিখিত ভক্তমাল ও আইন আক্‌বরী নামক মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেকেন্দর লোদীর রাজ্য সময়ে কবীরদাস জীবিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিত সময়ের এইরূপ সামঞ্জস্য হওয়ায় উহার প্রতি বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ

লক্ষিত হয়। এক্ষণে, সেকেন্দর ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হন ও ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহলীলা সম্বরণ করেন। অতএব, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কবীর দাস জীবিত ছিলেন, তদ্বিষয়ে অধিক সংশয় আছে বলিয়া বোধ হয় না।

কবীর পন্থীরা ইহাও কহিয়া থাকেন যে কবীর চারিযুগেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যযুগে তিনি সত্যসুকৃত, ত্রেতায় মুনীন্দ্র, দ্বাপরে করুণাময় ও কলিতে কবীর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে "জ্ঞানী" নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, এক ধরণের ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য, ভিন্ন ভিন্ন লোককে একই মহাপুরুষের অবতার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায়।

কবীরদাসের জন্মের বিষয় অনেক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার সকল গুলিই এরূপ অসংলগ্ন ও অলৌকিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, কোনটীকেই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই একটী বিষয়ে অন্ততঃ তাঁহার জীবনী লেখক দিগের মধ্যে এক মত দেখিতে পাওয়া যায় যে, নুরা নামক একজন জোলাহা (মুসলমান জাতীয় তন্তুবায়) তাঁহার পিতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই নুরাকে অনেকে তাঁহার পিতা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, কোন সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণ জাতীয়া এক বিধবা যুবতী বাস করিতেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া একজন ব্রাহ্মণ যোগীর উপাসনা করিবার স্থান লেপন, মার্জ্জন ও পরিষ্কার করিতেন। যোগীবর ব্রাহ্মণ

কন্যার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া এক দিন তাঁহাকে বরদান করিলেন যে, তুমি পুত্রবতী হও। এই বর প্রদানের কথা শুনিবা মাত্র ব্রাহ্মণ কন্যার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি নিরতিশয় ভীত ও চিন্তাযুক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ কুলের বিধবা; আমার সন্তান জন্মিলে লোকে কি মনে করিবে? লজ্জা ও ভয়ে বিকলা হইয়া তিনি স্বীয় আত্মীয়গণকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ কন্যার আত্মীয় স্বজনগণ যোগীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনি এই যুবতীকে কিরূপ বরদান করিলেন? ইনি যে বিধবা ব্রাহ্মণ দুহিতা। ইহাঁর গর্ভে সন্তান জন্মিলে যে ইহাঁর সর্ব্বনাশ হইবে, কলঙ্কের সীমা পরিশেষ থাকিবে না—জাতিকুল হইতে বিচ্যুত হইয়া দুরবস্থার একশেষ হইবে। আপনার সেবার কি এই পরিণাম দাঁড়াইবে? অতএব, আপনি দয়া করিয়া ইহাঁকে যে বরপ্রদান করিযাছেন,তাহার প্রতিহার করুন।" তপস্বী ব্রাহ্মণ, এই সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু কহিলেন "আমি একবার যে কথা বলিয়াছি তাহা কোনও রূপে মিথ্যা হইতে পারে না। আমার আশীর্ব্বাদে এই ব্রাহ্মণ কন্যা অবশ্যই পুত্রবতী হইবেন। তবে ইহাঁর অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, স্বাভাবিক যে নিয়মে স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে,ইহাঁকে সেরূপ করিতে হইবে না। ইহাঁর দক্ষিণ হস্তে একটী সুবৃহৎ স্ফোটক হইবে এবং উহা ফাটিয়া উহা হইতে সুন্দর বালক বিনি-র্গত হইবে।"

কথিত আছে যে, যোগীবর যেরূপ কহিলেন, সময় ক্রমে সেই প্রকার ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দুহিতার হস্তে একটী বৃহদাকার স্ফোটক উৎপন্ন হইল এবং নবম দিবসে যৎকালে তিনি "লাহার তালাব" নামে কোনও হ্রদে তৈজসাদি ধৌত করিতেছিলেন, সেই সময় উহা ফাটিয়া গেল ও উহা হইতে অতি সুলক্ষণ যুক্ত সুন্দর বালক রূপে কবীর আবির্ভূত হইলেন। বিধবা লজ্জানিবন্ধন সন্তানটীকে গৃহে আনয়ন করিতে না পারিয়া, অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে, একটী বৃহদাকার পদ্ম পুষ্পের উপর সংস্থাপন করিয়া উহা হ্রদের জলে ভাসাইয়া দিলেন।

উৎপলশায়ী কবীর হ্রদের জলে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। এমন সময়, মুসলমান জোলাহা জাতীয় নুরা নামক এক ব্যক্তি, কোনও প্রতিবাসীর বিবাহ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তিনি শ্রবণ করিলেন যে জলে ভাসমান শিশু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে "তুমি আমাকে বারাণসীতে লইয়া চল।" সদ্যোজাত শিশু সন্তানকে কথা কহিতে শুনিয়া নুরা প্রথমতঃ তাহাকে প্রেত জ্ঞানে, তাহার নিকট হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পলায়ন করেন। কিন্তু সেখানেও বালক তাঁহার সম্মুখে গিয়া আশ্রয় ও আহারীয় প্রার্থনা করিতেছে, ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ইহার পর, নুরা দৈববাণী শ্রবণ করিলেন যে, কে যেন তাঁহাকে অলক্ষিত ভাবে আদেশ করিতেছেন:— 'নুরা! তুমি বালকটীকে লইয়া গিয়া তাহার লালন পালন কর, তোমার মঙ্গল হইবে।'

এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া নুরা শিশু সন্তানটী গ্রহণ করিলেন ও গৃহে লইয়া গিয়া স্বীয় ভার্য্যা নিমাকে প্রদান করিলেন। নিমার

কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না। সুতরাং তিনি অতীব যত্নের সহিত কবীরের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কবীরকে কোনও দেবতা বিশেষের অবতার এবং পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশ সমুদ্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, বোধ হয়, তাঁহার শিষ্যেরা উল্লিখিত আখ্যায়িকার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কবীর যে জোলাহা জাতীয় মুসলমান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার অনেকানেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার জন্ম বিষয়ের যত প্রকার বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়, সর্ব্বত্রই নুরা এবং তাঁহার পত্নী নিমা দ্বারা তিনি শৈশবাবস্থায় ও বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এরূপ কথিত হইয়া থাকে। আবুল ফাজল,স্বপ্রণীত আইন আকবরী নামক গ্রন্থে,তাঁহাকে সুফী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুফী সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা কেবল এক মাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং কোনও রূপ প্রবাদ বা ঔপ-ধর্ম্মিক অনুশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন না। ইহাঁদের ধর্ম্ম বিশ্বাস অনেকটা হিন্দুদিগের অদ্বৈতবাদের ন্যায়। অপিচ, ইহাঁর নাম "কবীর" ও ইহাঁর পুত্রের নাম "কমাল" শব্দ আরবীয়। কোনও হিন্দুকে স্বীয় সন্তানের এরূপ বিজাতীয় নাম রক্ষা করিতে দেখা যায় না। কর্ণাল মাল্‌কল্‌ম্ ইহাঁকে "মুসলমান কবীর" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল কারণে কবীরকে নিশ্চয় মুসলমান বলিয়াই বিবেচনা হয়। স্বীয় "বীজক' নামক গ্রন্থের কোনও কোনও স্থলে তিনি যে প্রকার মর্ম্মান্তিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত সকল আক্রমণ করিয়াছেন, স্বয়ং মুসলমান না হইলে তাহা কখনই করিতে সক্ষম হইতেন না। হিন্দু হইয়া সেরূপ মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতেছেন

ইহা দেখিলে তৎসময়ের প্রভাবশালী মুসলমানেরা তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে নির্যাতন করিত এবং হয়ত তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে ক্রুটী করিত না। কবীরের মৃত্যুর পর মুসলমানেরা স্বজাতীয় বলিয়া তাঁহার দেহ সমাহিত করিতে চায়। পরন্তু, এরূপ প্রবাদ আছে যে অবশেষে তাঁহার মৃত দেহ পুষ্পরাশিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং উহার অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক মুসলমানেরা গ্রহণ করিয়া, স্বীয় স্বীয় প্রথানুসারে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

কবীরপন্থীদিগের তৃতীয় মোহান্ত জমাল। ইহাঁর পর, এই সম্প্রদায়ের প্রধানের পদ হিন্দু মোহান্তদিগের হস্তে পতিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহাঁদের ধর্ম্মমত অধিকতর হিন্দু আকার ধারণ করে, সুতরাং মুসলমানেরা কালক্রমে তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পাড়ন। যদিও অদ্যাপি কবীর দাস প্রচারিত ধর্ম্মমতের মধ্যে মুসলমানদিগের বিশ্বাসোপযোগী অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহার আকার এক্ষণে এতদূর হিন্দু ধর্ম্মের অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে ইহাকে বৈষ্ণবদিগের একটী সম্প্রদায় ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

তুলসীদাস প্রভৃতি মহাজনের ন্যায় কবীরের বিষয়ে ও অনেকানেক অলৌকিক আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়া থাকে।

অল্প বয়সেই কবীরদাসের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল যে, তিনি সেই সময়ের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বৈষ্ণব চূড়ামণি রামানন্দ স্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ও অন্যান্য বৈষ্ণব দিগের ন্যায় রামানন্দের জাত্যাভিমান প্রভৃতি মনের সংকীর্ণ ভাব এককালে তিরোহিত হয় নাই। নীচ জাতীয় কবীরের

পক্ষে সেই জন্য রামানন্দের শিষ্য হইয়া তাঁহার সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে বিষয় পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। যেমন করিয়া হউক, স্বামীজীর দলে প্রবিষ্ট হইতেই হইবে, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বীয় মনোরথ সিদ্ধির কোনও উপায় না দেখিয়া তাঁহাকে যার পর নাই চিন্তিত ও নিরুৎসাহ হইতে হইয়াছিল। অবশেষে পশ্চাল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

রামানন্দের অভ্যাস ছিল যে,তিনি অতীব প্রত্যূষে,অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অন্ধকার থাকিতেই,প্রতিদিন গঙ্গাতে প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেন। এক দিবস, স্বামীজী স্নান করিতে জলে নামিয়াছেন; আকাশ কথঞ্চিৎ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রের অন্ধকার এককালে বিদূরিত হয় নাই, পথ ঘাট পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, এমন সময়, কবীর দাস ধীরে ধীরে ঘাটের নিকট গমন করিয়া নিঃশব্দে একটী সংকীর্ণ সোপানের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে, রামানন্দ স্নান করিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিবার সময়, যেমন সেই সোপানটীতে পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি কবীরের নিশ্চেষ্ট দেহ তাঁহার চরণ তলে বিদলিত হইল। কোনও অস্পৃশ্য শবের উপর পদবিক্ষেপ করিয়াছেন, এই মনে করিয়া স্বামীজী এককালে "রাম! রাম!" এই কথা বলিয়া উঠিলেন। কবীর দাস অমনি গুরু রামানন্দ-মুখ-বিনিঃসৃত তারকব্রহ্ম রামনাম মূলমন্ত্র ভাবে গ্রহণ করিয়া, উহা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে, দূরে প্রস্থান করিলেন।

কবীরের শিষ্যেরা তাঁহার দীক্ষিত হইবার বিষয়ে উল্লিখিত আখ্যায়িকার বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহার বৈষ্ণব দলে প্রবিষ্ট হইয়া রামানন্দ স্বামীর শিষ্য হইবার বিষয়ে অন্যরূপ বিবরণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামানন্দজী প্রথমতঃ রামানুজ স্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই রামানুজ দলের বৈষ্ণবেরা জাতিভেদ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। রামানন্দ তীর্থদর্শন ও দেশ ভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিবিধস্থানে পরিভ্রমণ করেন। দেশ বিদেশে এতাধিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার ও জাতি রক্ষা করা কোনও প্রকারে সম্ভবপর নহে, এই বিবেচনায় তাঁহার সম্প্রদায়ের অপরাপর সাধুরা, রামানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট ও অপাংক্তেয় মনে করিয়া কেহই তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন পানাদি করিতেন না। এই সমস্ত অভদ্রোচিত অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রামানন্দ একটী পৃথক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। এই সম্প্রদায় তাঁহার নামানুসারে "রামানন্দী" বলিয়া বিখ্যাত হইল। গুরু রামানুজের দলস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেরূপ জাতিভেদ ও নানাপ্রকার কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব ছিল, এই নূতন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার কিছুমাত্র রহিল না। হিন্দু, মুসলমান এবং নীচ জাতীয় লোকদিগকে ও তিনি আপনার দলে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সকল মনুষ্যই ভ্রাতা এবং সকলেই স্বীয় স্বীয় সাধনা দ্বারা সাধু হইতে পারেন, এই মত তিনি অতীব উৎসাহের সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে, অনেক হীন জাতীয় লোকে তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইয়া, তৎসম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করেন। রবিদাস নামক এক

জন চর্ম্মকার, সেন নামক জনৈক নাপিত ও জোলাহা কবীর দাস ইহাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে উচ্চ রাজপুত্র জাতীয় পিপা, ভবানন্দ, সুড়সুড়ানন্দ, সুখানন্দ আদির নাম ও শুনিতে পাওয়া যায়।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না যে, কবীরদাস অনায়াসে রামানন্দের দলভুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। স্বামীজী যদিও নীচ জাতীয়দিগকে স্বীয় সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না, তথাপি নিম্নশ্রেণীর কেবলমাত্র এরূপ লোকদিগকে গ্রহণ করা হইত, যাঁহারা বুদ্ধি, চরিত্রবল ও সাধনা বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইতে পারিতেন। এইরূপ লোকদিগকে "অবধূত" বলা হইত এবং বিশ্বাস করা হইত যে, তাঁহাদের উন্নত আত্মার প্রভাবে, তাঁহারা জাতিবন্ধনের সীমার অতীত। বোধ হয়, রামানন্দের শিষ্যত্ব প্রাপ্তির জন্য কবীরদাসকে অনেককাল অপেক্ষা করিতে ও মঠে দাসত্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পরীক্ষার অধীন হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

কবীরদাসের বিদ্যাভ্যাসের অবস্থার বিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা এক প্রকার নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তিনি অতীব বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং রামানন্দের শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইবার পর হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রামানন্দের সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন শিষ্য ছিলেন, তাহার মধ্যে কবীরদাস সর্ব্বপ্রধান। বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধি ও তপোনুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহার সতীর্থবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এই জন্য প্রথমতঃ গুরু তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। উচ্চজাতীয় শিষ্যগণ

মুসলমান তন্তুবায় পুত্রের সকল বিষয়ে এইরূপ প্রাধান্য ও সেই জন্য তাঁহার উপর গুরুর বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে হিংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু যখনি তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, কবীরের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ভজন সাধনের প্রভাবে তাঁহাদিগকে অপ্রতিভ হইতে হইত।

কবীরপন্থীদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, যে গুরু রামানন্দ প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে ক্ষীর ও পরমান্ন দ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিতেন। এজন্য সূর্য্যো-দয়ের সময়েই তাঁহার কিঞ্চিৎ সদ্য-দোহিত দুগ্ধের প্রয়োজন হইত। এই দুগ্ধ আহরণ করিবার ভার পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল। যাঁহার যে দিন বার হইত, তিনি সে দিবস রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া তাহা আনয়ন করিতে যাইতেন। এতাধিক প্রত্যূষে কিন্তু দুগ্ধ আহরণ করা নিতান্ত অনায়াস সাধ্য ছিল না। কবীর ভিন্ন অপর সকলেই অতি কষ্টে উহা অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু যে দিবস কবীরের বার হইত, সে দিবস দুগ্ধের কিছুমাত্র অপ্রতুল থাকিত না। গুরু প্রাতঃস্নানের পর মঠে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইতেন, যে কবীর একটী ভারে দুই কুম্ভ পরিপূর্ণ দুগ্ধ আনয়ন করিয়া, উপাসনা স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গুরু রামানন্দ কবীরের উপর যে প্রকার সন্তুষ্ট হইতেন, তাঁহার অপর শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি সেইরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতেন।

একদা রামানন্দের অপরাপর শিষ্যগণ গোপনে একত্রিত

হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে আমরা সকলেইত গুরুর জন্য দুগ্ধ আহরণ করিতে যাই, কিন্তু অতিকষ্টে যৎসামান্য মাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। পরন্তু, কবীর ক্ষণকাল মধ্যে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ কোথা হইতে আনয়ন করে? অতএব আইস, আমরা সকলে অতর্কিত ভাবে উহার পশ্চাদ্গমন করিয়া অবধারিত করি যে, তন্তুবায় পুত্র কোন উপায় দ্বারা বিনা আয়াসে এতাধিক দুগ্ধ আহরণ করে।

অনন্তর, যখন পুনর্ব্বার কবীরের দুগ্ধ আনয়ন করিবার বার আসিল, অন্ধকার থাকিতেই তিনি ভার লইয়া মঠের বাহির হইলেন। যখন তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তিন জন সতীর্থ অতি গোপন ভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কবীর একটী গোমতীর (গো-ভাগাড়ের) নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তথায় স্বীয় স্কন্ধালম্বিত ভার ও কুম্ভদ্বয় রক্ষা করিলেন। রামানন্দ স্বামীর অপর তিন জন শিষ্য, যাঁহারা কবীরের পশ্চাদ্গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা দূরে থাকিয়া কবীর কি করেন তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন। কবীর কিয়ৎকাল নিমিলিত নেত্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে "জুটো, জুটো, জুটো" (অর্থাৎ একত্রিত হও, একত্রিত হও, একত্রিত হও) এই কথা কয়েকটী মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিলেন। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে বিক্ষিপ্ত অস্থিসমূহ সঞ্চালিত হইয়া একটী পশু কঙ্কালের ন্যায় একত্রিত হইয়া যথাস্থানে সংযোজিত হইয়া গেল। ইহার পর পুনর্ব্বার কবীরের মুখ হইতে "সাজো, সাজো, সাজো" (সুসজ্জিত হও, সুসজ্জিত হও, সুসজ্জিত হও) এই কয়েকটী কথা নিঃসৃত হইল, আর

দেখা গেল যে, রক্ত, মাংস, চর্ম্ম, লোমাদিতে ঐ কঙ্কাল আবৃত হইল। এইরূপে "উঠো, উঠো, উঠো" বলিয়া তিনবার আদেশ করাতে একটী অতি আশ্চর্য্য দুগ্ধবতী জীবন্ত গাভী উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর, কবীর দ্রুতপদে কুম্ভদ্বয় লইয়া তাহার বাঁটের নিম্নভাগে রাখিয়া দিয়া "ভরো, ভরো, ভরো" (পরিপূর্ণ কর, পরিপূর্ণ কর, পরিপূর্ণ কর) এই কথা কয়টী উচ্চারণ করিবা মাত্র অজস্রধারে কুম্ভ মধ্যে দুগ্ধ নিপতিত হইয়া নিমেষের মধ্যে কুম্ভ দুইটী পরিপূর্ণ করিল। ইহার পর, কবীর আদেশ করিবামাত্র গাভী শয়ন করিল এবং তাহার রক্তমাংস চর্ম্মরোমাদি অদৃশ্য হইয়াগেল! অবশেষে যে যে স্থানে যে যে অস্থিগুলি পূর্ব্বে নিপতিত ছিল, সেগুলি সেই সেই স্থানে সরিয়া গেল। কবীর ও দুগ্ধের ভার স্কন্ধে লইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রাতঃকালে আহ্নিক পূজাদি সমাপনানন্তর গুরু রামানন্দ প্রচুর দুগ্ধ আনয়ন করিবার নিমিত্ত কবীরের ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়া অপর শিষ্যদিগের অমনোযোগিতা ও অসামর্থ্যের বিষয় উল্লেখ করিলেন ও প্রকারান্তরে তাঁহাদের নিন্দা করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের মনে বিদ্বেষ ভাব ও ক্রোধের সঞ্চার হওয়াতে, তন্মধ্যে একজন করজোড়ে নিবেদন করিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! আমরা সকলে আপনার শিষ্য; আপনি উপদেশ বা অনুশাসন করিবার উদ্দেশে আমাদিগকে যাহা বলিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু যাহা প্রকৃত, তাহা নিবেদন করিলে, বোধ করি, আমরা আপনার বিরাগভাজন হইব না। অতি প্রত্যূষে সদুপায় দ্বারা দুগ্ধ আহরণ করা বাস্তবিকই নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং আমরা একাদশ জনে, স্বীয় স্বীয় বার

উপস্থিত হইলে, অতি কষ্টে উহা সামান্য পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে একমাত্র কবীর যে অনায়াসে প্রচুর দুগ্ধ আনয়ন করেন, তাহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু তিনি যে কোন উপায় দ্বারা সচ্ছন্দে এই কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা এতদিন জানিতাম না। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে তাহার গূঢ় সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছি। গুরুদেব! আমরা অল্প মাত্র দুগ্ধ আনয়ন করি, ইহা সত্য, কিন্তু ঐ দুগ্ধ অতীব পবিত্র ও সদুপায়-লব্ধ, আপনার পূজার কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত। কিন্তু কবীর যে দুগ্ধ আনয়ন করেন, তাহা ইন্দ্রজাললব্ধ, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য—গোমতী হইতে সংগৃহীত; দেব পূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধের উপযুক্ত নহে।" এই বলিয়া কবীর যে প্রকারে দুগ্ধ সংগ্রহ করেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত, তাঁহারা গুরুর নিকট নিবেদন করিলেন। শিষ্যদিগের মুখে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়া রামানন্দ অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও কবীরকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অপরাপর শিষ্যেরা যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য কিনা। কবীর কহিলেন "ঘটনা সকলই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া দুগ্ধ কখনই ইন্দ্রজালসম্ভূত বা অপবিত্র নহে। পাপ-পরিপূর্ণ এই দগ্ধ সংসার ক্ষেত্রকে পবিত্র বলিয়া, পারত্রিক-জ্ঞান উদ্দীপ্ত-কারিণী গোমতীভূমি অস্পৃশ্য কেমন করিয়া বলিব? যেখানে মল, মূত্র, ইন্দ্রিয়সেবা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, অসহায়পীড়নাদি ব্যাপার অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, সেই সংসার পবিত্র এবং যেখানে ঐ সকলের চিহ্নমাত্রও নাই, বরং মৃত ও বিশুষ্ক অস্থিপঞ্জর হইতে দেহের নশ্বরত্ব ও সংসারের অনিত্যতা অনবরত সূচিত হইতেছে, সেই স্থান ঘৃণিত ও অপবিত্র, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করা

যায়? জীবন ও মরণে ভেদজ্ঞান কি জ্ঞানীর কার্য্য? দ্রব্যসংগ্রহ করে দৈব বলই বা কোন যুক্তিতে সাধারণ মানবীয় উপায় সমূহ হইতে অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায়? সাধনা-সঞ্জাত অলৌকিকী শক্তি ও ইন্দ্রজালে কি কিছুই ভিন্নতা নাই? অতএব, আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি আমার সতীর্থগণের মোহময় বাক্যে বিমোহিত হইয়া আমাকে দোষী বিবেচনা করিবেন না।"

কবীরের উল্লিখিত বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার অলৌকিক জ্ঞান ও সামর্থ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া রামানন্দ স্বামী, তাঁহার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, অতীব প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। তিনি অপরাপর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসগণ! কবীরকে তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও না। তাঁহার অমানবী শক্তি দেখিয়া যে তোমরা এখন পর্য্যন্ত ও তাঁহার পদানত হও নাই, ইহাই বিচিত্র। তিনি আমার শিষ্য হইলেও, আমি স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। তোমরা বলিতেছ, গোমতী হইতে সমানীত দুগ্ধ অপবিত্র, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না যে, মৃত গাভীর অস্থি পঞ্জর হইতে জীবন্ত গো কোথা হইতে আসিল? এবং তাহার দুগ্ধই বা কেমন করিয়া জন্মিল? অতএব দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ কর, কবীরের শরণাপন্ন হও। এরূপ মহাপুরুষের সংসর্গে থাকিয়া তোমরা কৃতার্থ হইতে পারিবে। আমিত কবীরের আনীত দুগ্ধে পিতৃকার্য্য করিতে অধিকারী হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।"

কবীরের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মবল দেখিয়া গুরু রামানন্দ

তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মত সমূহের বৈচিত্র, ঔদার্য্য, অভিনবভাব ও দুর্দ্দম্য সার্ব্বভৌমিকত্ব দেখিয়া স্বামী সময়ে সময়ে তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইতেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া গুরুশিষ্যে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ হইত না, এরূপ দিন ছিল না। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সঞ্জাত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায়, কবীর রামানন্দের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মতাবলম্বীদিগকে লইয়া একটী স্বতন্ত্র দল সংস্থাপন করিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত হিন্দু মুসলমান-দিগকে এক সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে আনয়ন করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই অভিপ্রায়ে, উভয় ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু কুসংস্কার ও বৃথা আড়ম্বর আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হইত, সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ও তীব্র প্রতিবাদদ্বারা তৎসমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। সময়ে সময়ে, পণ্ডিত ও মোল্লাদিগের জ্ঞানাভিমানের উল্লেখ করিয়া,তিনি পরিহাস করিতে বিরত হন নাই।

সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন ও জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার রীতিমত উদ্যম, বোধ হয়, ভারতবর্ষে কবীর দাসই সর্ব্বাগ্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, জীবহিংসার তুল্য মহাপাপ,জগতে আর কিছুই নাই। সকল মনুষ্যই সমান ও ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ। ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন না। এ সকল মায়ার কার্য্য, ও বাহ্য বিষয় গুলির প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। জীবাত্মা, সাধনা করিতে করিতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ব্রহ্মে বিলীন হয়। সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিবে, কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিবে না।

সংক্ষেপতঃ তাঁহার ধর্ম্ম এক প্রকার অদ্বৈতবাদের ছায়ায় সংগঠিত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, অনেক দিন কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের অরাজকতার পর, স্বাধীন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষে অনেকানেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের অভ্যুদয় হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই জাতীয় অনেক প্রসিদ্ধ মহাত্মার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে মহাপ্রভু চৈতন্য, বারাণসীতে কবীর দাস, পঞ্জাবে নানক শাহ ও দাক্ষিণাত্যে তুকারাম, এই সময়েই অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্য সমাজের ভ্রম প্রমাদ বিনষ্ট ও সত্য ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। রামানন্দ স্বামী সর্ব্বাগ্রে জাতি-ভেদমূলক ও সংকীর্ণ মতসংকুল প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মত সমূহে প্রয়োজনীয় তেজস্বীতা না থাকায়, সে গুলি ততদূর কার্য্যকারী হয় নাই। কিন্তু উল্লিখিত মহাত্মাদিগের চেষ্টায় কুসংস্কার ও সংকীর্ণ ভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল।

রামানন্দের সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, কবীর গৃহস্থধর্ম্ম ও স্বীয় পুত্র কলত্র ও ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ করেন। স্বীয় মত প্রচার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়া, এই সময় হইতে তিনি দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। গুরু রামানন্দের সহিত যদিও অনেক স্থলে তাঁহার মতের ঐক্য হইত না, তথাপি তিনি তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং সময়ে সময়ে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এই উপলক্ষে, কখনও কখনও কিছু দিন করিয়া তাঁহার পূর্ব্বতন সঙ্গী ও ধর্ম্মোপদেশকের সহিত একত্র বাস ও ধর্ম্মভাব বিনিময় করিবার অবসর পাইতেন।

আসক্তিবিহীন হইতে না পারিলে যে, মনুষ্যের মুক্তিপদ লাভ করিবার উপায় নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ উদাহরণ স্বরূপ একটী আখ্যায়িকার এ স্থলে অবতারণা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই জাতীয় উপাখ্যানের মধ্যে অলৌকিকত্বের উপাদান অধিক থাকিলেও, ইহার অন্তঃসার গ্রহণ করিলে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে যে, রামানন্দ স্বামীর আখাড়ার এক পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ নাগারা (এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র—ডঙ্কা) ও তদুপরি উহা বাজাইবার দুইটী কাঠী পড়িয়া থাকিত। উহাকে কেহ কখনও বাজাইতে দেখে নাই। ব্যবহারের অভাবে যন্ত্রটীর উপর ধূলিরাশি জমিয়াছিল ও স্থানে স্থানে লূতাতন্তুর বিস্তার হইয়াছিল। স্বামীজীর শিষ্যেরা এক দিবস বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আমরা চিরকাল এই যন্ত্রটী এস্থানে সংরক্ষিত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন ও ব্যবহার হইতে কখনও দেখি নাই। যদি অনুমতি হয় ত দেব পূজা ও আরত্রিকের সময় আমরা উহাকে বাদিত করি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বামী উত্তর করিলেন, "বৎসগণ! এই বাদিত্রটীর কোনরূপ ব্যবহার না দেখিয়া তোমাদের ও অন্য লোকের মনে কৌতূহল উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক বটে। কিন্তু পূজা পর্ব্বোপলক্ষে বাজাইবার জন্য উহা এ স্থলে রক্ষিত হয় নাই। আমি যৎকালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব, এই নাগারা সেই মুহূর্ত্তে আপনা হইতে বাজিতে থাকিবে।" শিষ্য দল বিস্ময়াপন্ন হইয়া আর কিছু বলিলেন না।

উল্লিখিত ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে, গুরু রামানন্দ কঠিন রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবস্থা মন্দ

হইয়া আসিতে লাগিল ও অবশেষে তাঁহার বাক্‌রোধ ও শরীর নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। কেবল চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত ছিল, কিন্তু তিনি কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন কিনা, তাহারও স্থিরতা ছিল না। শিষ্যগণ যখন দেখিলেন, গুরুর মৃত্যুকাল আগত প্রায়, রক্ষা পাইবার আর কোনও উপায় নাই, তখন তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আনয়ন করা যুক্তি-সিদ্ধ, তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিলেন। আশ্রম প্রকোষ্ঠের সম্মুখে সুবিশাল ছায়াশালী একটী প্রকাণ্ড বদরী বৃক্ষ ছিল। সকলে মিলিয়া গুরুকে তাহার তলে আনয়ন করিয়া শয়ন করাইলেন। তৎকালে রামানন্দের আর পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি করিবার সামর্থ্য ছিল না; সুতরাং তিনি চীৎ হইয়া শুইয়া রহিলেন। চক্ষের পলক মাত্র পতিত ও উহা হইতে সময়ে সময়ে, অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল, আর কোনও জীবনের চিহ্ন অনুভব করিতে পারা যায় নাই। কিছুকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে স্বামীজীর দেহ ত্যাগ হইল। শিষ্যকুল প্রথমতঃ শোক-সন্তপ্ত হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মৃতদেহ শ্মশান ভূমিতে লইয়া গিয়া যথারীতি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এই সময়, কবীর দাসও স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, কিছু দিন হইতে সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে, শিষ্যকুল আশ্রমের দ্বারদেশে সমবেত হইয়া, স্বামীর গুণানুকীর্ত্তন ও তদীয় নির্ম্মল জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন, এমন সময়, তাঁহাদের মধ্যে একজন অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! জীবিতাবস্থায় গুরুদেব সর্ব্বদা বলিতেন

যে, যৎকালে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, মঠস্থিত ঐ নাগারাটী সেই সময় আপনা হইতে বাজিতে থাকিবে। এক্ষণে ত গুরুর বৈকুণ্ঠ গমন হইল, কই নাগারা ত বাজিল না? তবে কি স্বামী রামানন্দের কথা মিথ্যা হইল, না তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন নাই?” এই কথার অবতারণা হইবামাত্র, শিষ্যদিগের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন সত্যইত; গুরু মহারাজ আমাদিগকে কতবার বলিয়াছেন যে, তিনি যে দিন বৈকুণ্ঠে যাইবেন, ঐ বাদিত্রটী সেই দিন, আপনা হইতেই বাজিবে। কেহ বলিলেন যে, রামানন্দ বৈকুণ্ঠে গমন করেন নাই, একথা ত হইতেই পারে না, তবে, তাঁহার কথার যাথার্থ্য রহিল না, অগত্যা ইহা স্বীকার করিতেই হইতেছে। আবার কেহ বলিতে লাগিলেন যে, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হউন আর না হউন, রামানন্দের কথা মিথ্যা হইবে, এরূপ আমরা স্বীকার করিতেই পারি না। এইরূপ, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে লাগিল, কিন্তু কোনওরূপ মিমাংসা হইল না। এতাবৎকাল কবীর দাস একপার্শ্বে বিমর্ষভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, উপস্থিত তর্কবিতর্কে কিছুমাত্র যোগ দেন নাই। তদীয় পূর্ব্বতন সতীর্থগণ তাঁহাকে কথঞ্চিৎ ঘৃণা ও ঈর্ষার চক্ষে অবলোকন করিতেন, এই জন্য তিনি বিশেষরূপে আহূত না হইলে, তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা যোগদান করিতেন না। পরন্তু তাঁহার উৎকৃষ্টতর জ্ঞান ও সাধনার বিষয় সকলে মনে মনে জানিতেন। এই সময়, একজন শিষ্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আচ্ছা কবীর। তুমি ত আমাদের মধ্যে প্রধান, স্বীয় প্রতিভাবলে এক স্বতন্ত্র সম্প্র-

দায়ের স্বামী পদে অভিষিক্ত। কিন্তু এতাবৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া আছ; এ বিষয়ে তোমার মত কি?" কবীর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হে শান্তগণ, গুরু রামানন্দ স্বামীর কথা যে মিথ্যা হইবে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। তাঁহার বৈকুণ্ঠ গমন হইলে নাগারা অবশ্যই আপনা হইতে বাজিয়া উঠিত।" "তবে কি রামানন্দ স্বামীর বৈকুণ্ঠলাভ হয় নাই? যদি তাঁহার ন্যায় সাধু বৈকুণ্ঠে স্থান না পান, তাহা হইলে আর কে তথায় গমন করিবে?" এই বলিয়া সকলে একবাক্যে আপত্তি করিলেন। কবীর উত্তর করিলেন, "শান্তগণ! সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, জীবের মোক্ষপদ লাভ করিবার উপায় নাই। এই আসক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই লোকে বারম্বার সংসার মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভগবানের বিচার ও করুণার সমন্বয় এই স্থলে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায়। যে প্রবলা বিষয় ভোগেচ্ছার পরিতৃপ্তি হয় নাই, তাহা লইয়া যদি জীব ইহলোক ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার কত ক্ষোভ হয় ও সে আপনাকে কি পরিমাণে দুর্ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করে? তাহার মনে হয় যে, মনুষ্য জন্ম তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, না হইলেই ভাল ছিল। এরূপ ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়, ইহা দয়াময় অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতার স্বভাবের বিরুদ্ধ। আবার, এই সমস্ত বিষয়-বাসনা মুক্তির প্রতিরোধক এবং অনেক স্থলে, নরকের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা পরতন্ত্র মানবাত্মা স্বীয় আসক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, প্রদীপ্ত অনলে কীটকুলের ন্যায়, এই প্রজ্বলিত নরকাগ্নিতে আসিয়া নিপতিত হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারেই তাহাকে এইরূপ কার্য্য করিতে হয়। বারবার

এই সমস্ত বিষয় ভোগের প্রবল হুতাশনে দগ্ধীভূত হইয়া যৎকালে তৎপ্রতি অরুচি ও ক্রমশঃ তজ্জনিত বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখনই আসক্তি বিহীন আত্মারাম সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রতি-নিবৃত্ত হয় এবং জীবাত্মার শেষ নিয়তি মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। আমাদের মহাত্মা গুরু রামানন্দ স্বামীও বোধ হয় এই প্রকার কোন আসক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সংসারক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছেন। অনাসক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে (মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে) পারেন নাই।" কবীর দাসের উল্লিখিত রূপ বিচারের কথা শ্রবণ করিয়া অপরাপর শিষ্যেরা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তবে কি তোমার বিবেচনায় বৈরাগীশ্রেষ্ঠ রামানন্দ সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই?" কবীর কহিলেন "আমি ঠিক সে কথা বলিতেছি না। রামানন্দ স্বামী একজন অতি উচ্চ দরের সাধক ছিলেন। অনেক বিষয়ে, তিনি সংসার বাসনা ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংযমকল্পে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তবে কিনা, সময়ে সময়ে, একটী সামান্য ভোগাসক্তিতে কিয়ৎ কালের জন্য জীবের মুক্তির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। অপিচ, প্রথম শ্রেণীর সাধকদিগকেও কখনও কখনও, সামান্য বিষয়ে, এইরূপ আসক্তির অধীন হইতে দেখা যায়। স্বামীজীরও এই প্রকার কোনও বিষয় ভোগের ইচ্ছা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জন্মিয়া থাকিবে, যাহা পরিপূরণ বা সাধনাদ্বারা দমন করিবার অবসর তিনি প্রাপ্ত হন নাই। সেই জন্য হয়ত তাঁহাকে পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া আকাঙ্ক্ষিত ফল ভোগ করিতে হইতেছে।"

জ্ঞানী কবীর এই সকল যুক্তির কথা বলিলে পর, রামানন্দের

শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কবীর! তুমি ভক্ত মণ্ডলীর অগ্রণী, সংযতেন্দ্রিয়, স্বীয় গুরুকে, বিষয়াসক্ত সামান্য মনুষ্যের আকারে অঙ্কিত করিয়া, আমাদের হস্ত হইতে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। তুমি যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলে, উপযুক্ত প্রমাণদ্বারা সেই গুলি সাব্যস্ত করিয়া দেও; তাহা না হইলে, আমরা সকলে তোমাকে স্বর্গগত, যোগপরায়ণ গুরুর নিন্দাকারী বলিয়া, লোকের নিকট তোমার অপযশ কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইব।" কবীর বলিলেন, "ভাল, কিরূপ প্রমাণ পাইলে তোমাদের মনে প্রত্যয় জন্মে?" শিষ্যেরা কহিলেন "তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা দেখাইয়া দেও যে, কোন্ বিষয়ে ভোগাসক্তি লইয়া স্বামী পরলোক গমন করিয়াছেন এবং তাহার ফল স্বরূপ তাঁহার কিরূপ গতি হইয়াছে।" কবীর কহিলেন, "আচ্ছা চল, অন্তিমাবস্থায় গুরু যে স্থলে কালযাপন করিয়াছিলেন, সকলে মিলিয়া তথায় গমন করি ও তত্রত্য দ্রব্য-জাত এবং অবস্থা সমূহ দর্শন করিয়া, কোনও আলোক প্রাপ্ত হইতে পারা যায় কি না, দেখা যাউক।"

এইরূপ কথোপকথনের পর রামানন্দস্বামী, জীবনের শেষাবস্থায়, যে বদরীবৃক্ষের তলে রক্ষিত হইয়াছিলেন, সকলে একত্র হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। অতঃপর সকলে বলিতে লাগিলেন "গুরুদেব ত এই স্থলে শয়ান ছিলেন; তাঁহার পাদদ্বয় এইখানে ছিল, দেহ এই স্থানে এবং মুখ মণ্ডল ও নয়নযুগল এই স্থলে অবস্থিত ছিল।" যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, যে স্থলে সম্ভবতঃ স্বামীর চক্ষুদ্বয় ছিল বলিয়া বিবেচনা হইল, কবীর তাহার ঊর্দ্ধদিকে নিরীক্ষণ করিলেন। উপরে চাহিবামাত্র

দেখিতে পাইলেন যে, অতি সুন্দর, সুবর্ণাভ একটী সুবৃহৎ বদরী ফল হরিদ্‌বর্ণ পত্র রাশির মধ্যে আলম্বিত রহিয়াছে। এই ফলটী তাঁহার নয়নগোচর হইবামাত্র কবীর বলিয়া উঠিলেন, "হইয়াছে; এই স্থানে স্বামীজীর মস্তক ছিল এবং তিনি কেবল ঊর্দ্ধদিকেই দেখিতে ছিলেন। ঐ মনোহর ফলটী মুমূর্ষাবস্থায় দর্শন করিয়া উহা ভক্ষণ করিবার জন্য তাঁহার মহতী আসক্তি জন্মে। কিন্তু তৎকালে তাঁহার এতটুকু জ্ঞান থাকিলেও, বাক্‌শক্তি রুদ্ধ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ ও নিস্পন্দ অবস্থায় ছিল। অতএব তিনি কথা বা ইঙ্গিতদ্বারা আপনার সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই সময় তাঁহার দেহান্ত হয় ও তিনি এই ফল ভোজনের অতৃপ্ত আসক্তি লইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং তাঁহার বৈকুণ্ঠ গমন (মোক্ষপদ প্রাপ্তি) হয় নাই। ফল ভক্ষণের প্রবলা আসক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি বদরী ফলের মধ্যে কীট যোনি প্রাপ্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন।"

রামানন্দের অপরাপর শিষ্যগণ কবীরের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া যুগপৎ শোক ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন, "কবীর! এ বিষয়ের এখন ও অনেক প্রমাণের আবশ্যক। আমরা বদরী ফলটী বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া আনিতেছি; তোমার কথা যে অলীক নহে, তুমি তাহা সপ্রমাণ করিয়া দেও।" এই কথা বলিতে বলিতে, এক ব্যক্তি ঐ ফলটী বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া আনিলেন। ফলটী অতীব সুন্দর, সুপক্ক ও বৃহৎ। সকলে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, উহার উপর কোনও স্থানে ছিদ্রাদি নাই। তখন তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন যে, ইহার মধ্যে কীট থাকা কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে।

কবীর বলিলেন, "ভাঙ্গিয়া দেখ, সকল সংশয় দূর হইবে।" এই কথা বলিবামাত্র একজন ঐ বদরী ফলটী দুই খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যাই ফলটী ভঙ্গ করা হইল, অমনি উহা হইতে সুবর্ণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ, একটী তেজঃপুঞ্জ কীট, ভূমিতলে পতিত হইয়া, বিচরণ করিতে লাগিল। কবীর বলিলেন "এই দেখ স্বামী রামানন্দ। কোথায় বৈকুণ্ঠ আর কোথায় তিনি? নাগারা বাদিত হইবে কোথা হইতে?" সমবেত শিষ্যগণ অতীব বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়া কিঞ্চিৎকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন। অনন্তর, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "অনেক বদরী ফলের মধ্যেই ত কীট দেখিতে পাওয়া যায়। এই কীটই যে গুরু রামানন্দ, তাহার প্রমাণ কি?" "আবার প্রমাণ চাহিতেছ?" এই বলিয়া সাধু কবীর, রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, স্বীয় চরণসংলগ্ন কাষ্ঠ পাদুকাদ্বারা যেমন ঐ কীটটীকে বিদলিত করিয়া ফেলিলেন, অমনি "গুড় গুড় গুড় গুড়" শব্দে নাগারা বাজিয়া উঠিল। তখন মহাত্মা কবীর সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঐ দেখ সাধু রামানন্দ বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছেন। তাঁহার কথা কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে?"

ইহার পর বারাণসীর চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া, কবীরদাস নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কোন আখাড়া বা অন্য প্রকার ধর্ম্মমণ্ডলী দেখেন, সেখানকার মহান্ত ও প্রধান পুরুষদিগের সঙ্গে ধর্ম্মমত লইয়া বিচার করেন। অনেকস্থলে প্রতিপক্ষীয় সাধু ও পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লন। এইরূপে তিনি মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ নগর পরিভ্রমণ করিয়া-

ছিলেন এবং তত্রত্য প্রধান প্রধান হিন্দু ও মহম্মদীয় আচার্য্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের মধ্যে আপনার ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়, ঝুসী গ্রাম নিবাসী সেখ তক্কী নামক একজন মুসলমান ফকিরের সহিত, তাঁহার তুমুল বিচার হয়। কবীরের রচিত একটী রমৈনীতে, (রমৈনী একপ্রকার ছন্দের শ্লোক সমষ্টি) তিনি যে প্রকার বিচারদ্বারা তক্কীকে পরাভব করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

কবীরের এই সমস্ত প্রচার যাত্রার ব্যয় স্থানীয় সমৃদ্ধ লোক-দিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত, সুতরাং তাঁহার ও তদীয় শিষ্যগণের আহারাদির বিষয় কোনও রূপ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইত না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধু ভক্তদিগের এইরূপ সেবা করা এতদ্দেশীয় লোকদিগের একটী প্রধান গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কবীরদাস এই প্রকারে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া দেশ বিদেশে স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সত্যের পতাকা চতুর্দ্দিকে অনুকূল বায়ু পাইয়া সতেজে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। তিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত উপধর্ম্মকে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের মূল-সূত্র সমূহ পুরাণাদি মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। সামান্য লোকেরা, তাঁহার উপদেশাবলী, অতীব যত্নের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিল ও সমস্ত দেশের মধ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে দেশে যে অযৌক্তিক অনুষ্ঠান সকল প্রচলিত ছিল, তাহার অসারতা তিনি স্পষ্টাক্ষরে ও তন্ন তন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে ক্রটী করেন নাই।

এই সময় হইতে কবীরদাস তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশের সর্ব্বস্থানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইতে লাগিল। কথিত আছে যে কটক, মম্বই, পুরুষোত্তম এবং বিহার অঞ্চলে তিনি বহু সংখ্যক মঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি কবীর পন্থীদিগের দ্বাদশটী প্রধান মঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে বারাণসীস্থিত "কবীর চৌরা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অপরাপর মঠের সাধুরা, এই "কবীর চৌরা" দর্শন করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

কবীরদাস যে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাহার সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল, একথা তাঁহার হিন্দু শিষ্যেরা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্র ছিল; এবং তিনি তৎকালিক অপরাপর জোলাহাদিগের রীতি অনুসারে বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কবীরের পত্নী অনক্ষরা ও অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিলেও, স্বীয় ভর্ত্তার ধর্ম্মমতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে ঈশ্বর ও জীব-নিস্তার বিষয়ক অতীব কূট ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বকথা লইয়া, কবীরের সঙ্গে বিচার করিতেন। এ সকল কথার যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা কিন্তু সহজ নহে।

কবীরের যে কমাল নামে এক পুত্র ছিল এবং তিনি যে উত্তর কালে মম্বই মঠের মহান্ত হইয়াছিলেন, এ কথার কেহই প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু কবীরপন্থীরা বলেন যে, কমাল তাঁহার ঔরস পুত্র ছিলেন না। এই কথা প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধ করিবার

ছিলেন এবং তত্রত্য প্রধান প্রধান হিন্দু ও মহম্মদীয় আচার্য্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের মধ্যে আপনার ধর্ম্মমত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়, ঝুসী গ্রাম নিবাসী সেথ তকী নামক একজন মুসলমান ফকিরের সহিত, তাঁহার তুমুল বিচার হয়। কবীরের রচিত একটী রমৈনীতে, (রমৈনী একপ্রকার ছন্দের শ্লোক সমষ্টি) তিনি যে প্রকার বিচারদ্বারা তকীকে পরাভব করেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

কবীরের এই সমস্ত প্রচার যাত্রার ব্যয় স্থানীয় সমৃদ্ধ লোকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত, সুতরাং তাঁহার ও তদীয় শিষ্যগণের আহারাদির বিষয় কোনও রূপ চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইত না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধু ভক্তদিগের এইরূপ সেবা করা এতদ্দেশীয় লোকদিগের একটী প্রধান গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

কবীরদাস এই প্রকারে এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া দেশ বিদেশে স্বীয় মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সত্যের পতাকা চতুর্দ্দিকে অনুকুল বায়ু পাইয়া সতেজে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। তিনি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত উপধর্ম্মকে নির্দ্দয়রূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মের মূলসূত্র সমূহ পুরাণাদি মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। সামান্য লোকেরা, তাঁহার উপদেশাবলী, অতীব যত্নের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিল ও সমস্ত দেশের মধ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে দেশে যে অযৌক্তিক অনুষ্ঠান সকল প্রচলিত ছিল, তাহার অসারতা তিনি স্পষ্টাক্ষরে ও তন্ন তন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে ত্রুটী করেন নাই।

এই সময় হইতে কবীরদাস তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশের সর্ব্বস্থানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইতে লাগিল। কথিত আছে যে কটক, মম্বই, পুরুষোত্তম এবং বিহার অঞ্চলে তিনি বহু সংখ্যক মঠ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি কবীর পন্থীদিগের দ্বাদশটী প্রধান মঠ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে বারাণসীস্থিত "কবীর চৌরা" সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অপরাপর মঠের সাধুরা, এই "কবীর চৌরা" দর্শন করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

কবীরদাস যে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাহার সন্তান সন্ততি জন্মিয়াছিল, একথা তাঁহার হিন্দু শিষ্যেরা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্র ছিল; এবং তিনি তৎকালিক অপরাপর জোলাহাদিগের রীতি অনুসারে বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কবীরের পত্নী অনক্ষরা ও অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিলেও, স্বীয় ভর্ত্তার ধর্ম্মমতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে ঈশ্বর ও জীব-নিস্তার বিষয়ক অতীব কুট ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বকথা লইয়া, কবীরের সঙ্গে বিচার করিতেন। এ সকল কথার যাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা কিন্তু সহজ নহে।

কবীরের যে কমাল নামে এক পুত্র ছিল এবং তিনি যে উত্তর কালে মম্বই মঠের মহান্ত হইয়াছিলেন, এ কথার কেহই প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু কবীরপন্থীরা বলেন যে, কমাল তাঁহার ঔরষ পুত্র ছিলেন না। এই কথা প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধ করিবার

অস্বীকার হইয়া কহেন যে, "রাম ভিন্ন আমি কাহাকেও জানিনা ; ভূপতিকে কি জন্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিব ?" বাদশাহ এরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দেন। কবীর কিন্তু জলমগ্ন না হইয়া কিয়দ্দূর ভাসিতে ভাসিতে গেলেন এবং তৎপরে তীরে উঠিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞায় একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইল ও সর্ব্বসমক্ষে কবীর তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার একগাছি কেশ পর্য্যন্ত ও দগ্ধ হয় নাই, যেমন তেমনি প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে বহির্গত হন। ইহার পর, বাদশাহ তাঁহাকে মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু হস্তী তাঁহাকে দেখিয়া পলায়ন করে। অবশেষে, সেকন্দর স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া মাহুতকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি কবীরের উপর দিয়া হস্তী চালাইয়া দাও। হস্তী নিকট গমন করিবা মাত্র কবীরের শরীর প্রকাণ্ড সিংহের রূপ ধারণ করিল। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া বাদশাহ অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া, করযোড়ে ও বিনীত বচনে, কবীরকে স্বীয় মানব দেহ ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কবীর তথাবৎ করিলে সেকন্দর তাঁহাকে অনেকগুলি মহাল জমিদারী দিতে চাহিলেন। কিন্তু সাধু তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন "রামই আমার ধন, পৃথিবীর ধনে কি হইবে? উহা দ্বারা কেবল পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মনান্তর সমুৎপন্ন হয়।" ইহার পর তিনি নিরাপদে স্বীয় চৌরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবাধে আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, কবীরদাস স্বীয় ধর্ম্মমতসমূহ হিন্দী পদ্যে লিখিতে তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং বৎসরে বৎসরে দূরদেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা এই সময় বিলক্ষণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রধান চেলাদিগের মধ্যে একজন ভিন্ন আর সকলেই সংসারত্যাগী বৈরাগী ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবদ্দশাতেই এবং কেহবা তাঁহার স্বর্গগমনের পর মহান্ত পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের নাম (১) ভাগোদাস। ইনি বীজক নামক কবীরপন্থীদিগের প্রধান নীতিগ্রন্থ সংকলন করেন। (২) ব্রহ্মগোপাল দাস। ইনি সুখনিদান নামক গ্রন্থের সংকলন কর্ত্তা; (৩) ধর্ম্মদাস। ইনি পূর্ব্বে রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, পশ্চাৎ কবীরের সম্প্রদায়ভুক্ত হন; (৪) চুড়ামণি দাস। ইনি ধর্ম্মদাসের পুত্র। ইহাঁর বংশধরগণ জব্বলপুরস্থ মঠের মোহান্ত; ইহাঁরা সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করায় বংশগুরু নামে অভিহিত, (৫) কমাল। ইনি কবীরের পুত্র। ইহাঁর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; (৬) অযোধ্যার জগজ্জীবন দাস। (৭) কটকের সাহেব দাস (৮) নিত্যানন্দ এবং (৯) কামানন্দ। ইনি দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা ভিন্ন আরও শত সহস্র শিষ্য ছিলেন, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মের বীজ সূত্র সমূহ অভ্যাস করিয়া আপামর সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দান করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই, কবীরদাসের ধর্ম্ম, পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পূর্ব্বে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত এবং উত্তরে বিহার হইতে দক্ষিণে মম্বই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সংক্ষেপতঃ ভারতবর্ষের সমস্ত অংশ, অন্ততঃ যতদূর পর্য্যন্ত

হিন্দীভাষা প্রচলিত, ততদূর ব্যাপিয়া, তাঁহার ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যদিও ইহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না যে, কবীরের জীবিতকালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্ম এতাধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহার স্বর্গারোহণের অনতিকালবিলম্বে যে এরূপ ঘটিয়াছিল, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা দ্বারকা, মম্বই, পুরুষোত্তম ও বিহারের প্রথম মোহান্তগণ সকলেই তাঁহার সহচর শিষ্য ছিলেন। কবীরের প্রাদুর্ভাবকালে রাস্তা ঘাটের অবস্থা এরূপ কদর্য্য এবং ভ্রমণ করা এত কঠিন ব্যাপার ছিল যে, তাঁহার এতাধিক দূরদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করার কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি ভারতবর্ষীয় বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চাল্লিখিত দশটী মঠের সকলগুলি না হউক, অধিকাংশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (১) বারাণসী চৌরা, (২) জগন্নাথ (পুরুষোত্তম) মঠ, (৩) দ্বারকা মঠ, (৪) ধনাবতী মঠ, (৫) জব্বলপুর মঠ, (৬) মম্বই মঠ, (৭) বড়োদা মঠ, (৮) গোরক্ষপুরের নিকট মগর মঠ, ও দাক্ষিণাত্যে অপর দুইটী মঠ।

কবীর পন্থীদিগের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ গুলিই কবীরের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফলতঃ তন্মধ্যে অধিকাংশের প্রণেতা যে তিনিই, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই পুস্তক গুলি হিন্দী দোহা ও চৌপাই ছন্দে লিখিত। আমাদের বাঙ্গলার পয়ার ও ত্রিপদীর ন্যায় হিন্দী ভাষায় এই দুইটী ছন্দই বিস্তৃতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কবীরদাস প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম "বীজক"। এই পুস্তকে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মতামত ও নিয়ম সমূহ বিস্তৃত

ভাবে লিখিত হইয়াছে। রমৈনী, শাখী, শব্দ ইত্যাদি এক একটী ছন্দে এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায় ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ছয় শত চুয়ান্ন অধ্যায়ে এই গ্রন্থ বিভক্ত বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু অনেক পুস্তকেই কতকগুলি প্রাচীন শাখী, শব্দ ইত্যাদির পরিবর্ত্তে নূতন নূতন রচনাও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বীজকের ভাষা প্রায় কথিত অপভাষার ন্যায়। রামায়ণ প্রণেতা তুলসীদাস প্রভৃতির ন্যায়, বিশুদ্ধ হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিবার অবসর প্রাপ্ত না হইলেও,কবীর অতীব বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত সূত্র সমূহ আদিম চিন্তা ও উপমাদি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু লিখিবার প্রণালী এরূপ দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ও গ্রাম্য দোষ-সঙ্কুল যে, অনেকস্থলে ভাব সংগ্রহ করা সুকঠিন। এই কারণে তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেক সময়ে মত ভেদ ও তর্কবিতর্কের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে।

বীজকের ছন্দোবিন্যাস অনেক স্থলে অভাবময় ও দূষণীয় বলিয়া বোধহয়। মুদ্রিত পুস্তক না থাকায় অনেকানেক লোকদ্বারা বারম্বার লিখিত হওয়াতে সম্ভবতঃ এরূপ ঘটিয়াছে। বিষয় সমূহ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার বা কোনও একটী প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হয় না। বিশৃঙ্খল ভাবে, যেথানে সেথানে, মায়ার প্রপঞ্চ, জীবহিংসার পাপ, হিন্দু মুসলমানদিগের ভ্রম প্রমাদ এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপদেশের অসারতার বিষয় যথেচ্ছভাবে লিখিত ও নিন্দিত হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার স্বীয় মত গুলির প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা কোনও স্থলে করা হয় নাই, সুতরাং সমস্তই দুর্ব্বোধ্য রহিয়া-

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোরক্ষপুরের নিকট মগর গ্রামে কবীরের স্বর্গোত্থান হয়। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দুরা তাঁহার দেহ দগ্ধ ও মুসলমানেরা সমাহিত করিতে ইচ্ছা করেন। এই বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন ও বিবাদ হওয়ায়, কবীরের আত্মা সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যে বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মৃতদেহ আচ্ছাদিত ছিল, তাহা উত্তোলন করিতে বলেন। বস্ত্র উত্তোলিত হইবামাত্র সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তাহার মধ্যে শব নাই, কেবল কতকগুলি সুগন্ধ পুষ্প পড়িয়া রহিয়াছে। অনন্তর, উভয় জাতীয়েরা সেই পুষ্পগুলি অংশ করিয়া লইলেন। বিজলী খাঁ নামক এক ব্যক্তি পাঠান-প্রমুখ মুসলমানেরা তাঁহাদের অংশের পুষ্পগুলি লইয়া মগর গ্রামে সমাহিত করিলেন এবং রাজা বীরসিংহের অধীনস্থ হিন্দুরা আপনাদের অর্দ্ধেক বারাণসীতে লইয়া গিয়া কবীর চৌরায় দগ্ধ করিলেন। অদ্যাবধি মগর গ্রামের সমাধি-মন্দির ও বারাণসীর "কবীর চৌরা" কবীরপন্থীদিগের অতি পবিত্র তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ও বহুসংখ্যক লোক ইহা দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষমধ্যে কবীর দাসই সর্ব্ব প্রথমে জাতি, ধর্ম্ম ও দেশ নির্ব্বিশেষে, সমৃদ্ধ ও নির্ধন, জ্ঞানী ও মূর্খ, সকল প্রকার লোককে ধর্ম্ম বিষয়ে এক সাধারণ ভূমিতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তিনি স্বীয় জীবদ্দশাতেই অনেকানেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর, নানক শাহ, জগজ্জীবন, দাদূ প্রভৃতি মহানুভবগণ ও তাঁহার অনুরূপ ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইহাঁদের সকলেই প্রাণপণে হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়দিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করেন। এই সমস্ত মহাত্মাগণ কবীরের শিক্ষার আশয় গ্রহণ করিয়া শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাঁদের গ্রন্থের অনেক স্থলে কবীরদত্ত উপদেশা-বলী সন্নিবেশিত আছে।

ধর্ম্ম বিষয়ে সহনশীলতা ও মানব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব আনয়ন করা কবীরের প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশের ভিত্তি স্বরূপ ছিল। অকারণে তর্ক ও বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার করিবার বিষয়ে তিনি একটী পরমোপকারী উপদেশগর্ভ শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সকল কবীরপন্থীরাই ঐ শ্লোকটী অভ্যাস করিয়া থাকেন। উহার অর্থ এইঃ—"সকলের নিকট গমন কর, সকলের সঙ্গে মিশ, সকলের নাম লও; আপনার মত গোপন রাখিয়া (সকলের নিকট) "হাঁ মহাশয়, হাঁ মহাশয়, হাঁ" এই কথা বল।

"সবসে হিলিয়ে সবসে মিলিয়ে, সবকে লিজিয়ে নাঁ।
অপনে মনকো দবকে বোলিয়ে হাঁ জী হাঁ জী হাঁ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে,সকলের নিকট গমনাগমন কর ও সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাক, আপনার মনের কথা সহসা কাহাকেও বলিও না। কিন্তু যে যাহা বলিবে,তাহাতে হাঁ, হাঁ, বলিবে, অর্থাৎ কাহারও কথার তীব্র প্রতিবাদ করিবে না। "সকলের নাম লও" অর্থাৎ ঈশ্বরকে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি, যে যাহা বলিয়া ডাকে, তাহা বলিবার ক্ষতি নাই। পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি বীজকের প্রথম রমৈণীতে লিখিয়াছেন, "তুমি ও আমি এক রক্ত-সম্ভূত, আর আমাদের উভয়কে একই প্রাণে প্রাণিত রাখিয়াছে; একই মাতা (অর্থাৎ মায়া) হইতে সমস্ত

কবীর দাস হিন্দুদেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে অতি তীব্রভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "সত্য সাহেবের (পরমেশ্বরের) উপাসনা কর, তিনি তোমাকে সকল পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি দশরথের বংশে মানবরূপে জন্মগ্রহণ বা লঙ্কার রাজাকে নির্যাতন করেন নাই। যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করেন নাই এবং তিনি কখনও দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেন নাই। তিনি জগতে যুদ্ধ করিয়া বিচরণ করেন নাই এবং বলীকে কষ্ট দিবার জন্য কখনও পাতালে যাত্রা করেন নাই। তিনি বালি রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই ও হিরণ্য-কশিপু দৈত্যকে উরুদেশে নিপাতিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করেন নাই। তিনি শূকর জন্ম গ্রহণ বা পৃথিবীকে বার বার নিক্ষত্রিয়া করেন নাই। তিনি কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে গোবর্দ্ধন ধারণ ও রাখালবালকদিগের সহিত একত্র হইয়া মথুরা ও বৃন্দাবনের অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান নাই। তিনি শালগ্রাম বা অন্য কোনও জাতীয় প্রস্তর অথবা জলচর মৎস্য বা কচ্ছপ নহেন। তিনি দ্বারাবতীতে মৃত ও হন নাই এবং তাঁহার জীবনহীন দেহ জগন্নাথে সমাহিত ও হয় নাই। কবীর বলেন, কেহ যেন এপ্রকার উপদেশের অনুসরণ না করে। যাঁহাকে সামান্য লোকে স্থূল-ভৌতিক দেহধারী বিবেচনা করে, তিনি পরম সূক্ষ্ম আত্মারাম।" স্থানান্তরে লিখিত আছে, "হে সাধুগণ! যাহা জন্মিয়াছে ও মরিতেছে, তাহা মায়াসম্ভূত। তিনি সকল অভাব-মোচন। তিনি কোথাও গমন বা কোন ও স্থান হইতে আগমন করেন নাই। তিনি মৎস্য বা বরাহ অবতার হন নাই বা শঙ্খাসুরকে বিনাশ করেন নাই। তিনি করুণাময় ও বৈর-

ভাব বিহীন, কেমন করিয়া অপর কাহাকেও বধ করিবেন? সেই বিধাতা শূকর হইয়া জন্মেন নাই এবং ধরণী বা নদীকে (গঙ্গাকে) মস্তকে বহন করেন নাই। এ সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের নহে, ভ্রান্ত জগৎ মিথ্যা বলে। জগতের লোকে বিশ্বাস করে যে, তিনি স্ফটীক স্তম্ভ ভেদ করিয়া নখর দ্বারা হিরণ্যকশিপুর অন্ত্রী নিষ্কাশন করিয়াছিলেন। এরূপ স্বভাব কি বিধাতার হইতে পারে? বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনি বলীকে ছলনা করেন নাই। ছল প্রপঞ্চ, মায়ার কার্য্য। সত্যের তত্ত্ব অবগত না হইয়া পৃথিবীর লোক বিপথগামী; মায়া তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। পরশুরাম রূপে তিনি পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করেন নাই। এটীও মায়ার কার্য্য। যাহারা সত্য গুরুর উপদেশ পায় নাই, তাহাদের জীবন বৃথা। সংসার-স্বামী সীতাকেও বিবাহ করেন নাই ও সেতু বন্ধনের জন্য সমুদ্রে মৃত্তিকা ও প্রস্তর নিক্ষেপ করেন নাই। যে এরূপ রঘুনাথের ধ্যান করে, সে অন্ধ। তিনি গোকুলে গোপ-গোপীদের সঙ্গে বসবাস করেন নাই বা রাজা কংসকে স্বহস্তে নিধন করেন নাই। তিনি পরম কারুণিক ও সকলের স্বামী। তাঁহার জয় পরাজয় কিছুই নাই। এমন বিধাতাকে বুদ্ধ ও বলা যায় না এবং অসুরদিগের নিধনেও তিনি ব্যাপৃত থাকেন না। অজ্ঞান ব্যক্তিরা ঈশ্বরের কার্য্য এইরূপ বিবেচনা করে এবং মায়া তাহাদিগকে বিপথে লইয়া যায়। এরূপ ঈশ্বর নিলঙ্কী হইয়া কলিঙ্গকে বধ করেন নাই। এ সমস্ত মায়ার প্রপঞ্চ মাত্র। এতদ্দ্বারা স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পরাজয় ঘটিয়াছে। ঈশ্বরের দশাবতার মায়ার কার্য্য। বিধাতার পূজা কে করিয়াছে? কবীর বলেন, সকল

শাস্ত্রেরা শ্রবণ করুন, যাহার জন্ম মৃত্যু আছে, সে মায়া হইতে সমুদ্ভূত।"

কবীরদাস মূর্ত্তি পূজার প্রতিবাদ করিয়া তাহার যথোচিত নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "শাস্ত্রগণ! পৃথিবী পাগল হইয়াছে। যদি আমি সত্য বলি, পৃথিবী আমাকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে, কিন্তু মিথ্যায় বিশ্বাস করে। আমি ধার্ম্মিক (ধর্ম্মাভিমানী) ব্যক্তিদিগকে দেখিয়াছি। তাঁহারা নিয়মিতরূপে প্রাতঃস্নান করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া প্রস্তরের পূজা করেন। তাঁহাদের কোনও জ্ঞান নাই। তাঁহারা প্রস্তর পিত্তলের পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তীর্থযাত্রা জন্য কল্পিত পুণ্যের অহঙ্কারে স্ফীত। তাঁহারা মাল্য এবং উষ্ণীষ ব্যবহার করেন এবং নাসিকাগ্রে তিলক ও বাহুতে ছাপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কল্পিত দেব-দেবীর গুণগান করেন। এই সকল লোকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" কবীরের গ্রন্থাবলীর মধ্যে লিখিত আছে, "মালা সমূহ কাষ্ঠ ও দেবমূর্ত্তি প্রস্তর মাত্র। গঙ্গা, যমুনা, জল বই আর কিছুই নহে। রাম ও কৃষ্ণের মৃত্যু হইয়াছে এবং চতুর্ব্বেদ অলীক গল্প।" আবার, "প্রস্তরের পূজা করিয়া যদি মুক্তি লাভ হয়, তবে আমি সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের আরাধনা করিব। গোধুম পেষণ করিবার যন্ত্র, এই সকল প্রস্তরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তদ্দ্বারা শস্য চূর্ণ করিয়া লোকের খাদ্যের আয়োজন করিতে পারা যায়।"

হিন্দু ও মুসলমানের উপাসনা পদ্ধতিকেও তিনি উপহাস করিয়াছেন। "পণ্ডিতেরা ভ্রান্তি বশতঃ বেদ পাঠ করে। যাহাদের সাধারণ বুদ্ধির অভাব, তাহারা নিয়মিতরূপে প্রাতঃ

ও সায়ংকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি ও অপরাপর বৃথা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। চারিযুগ গায়ত্রী পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যে, তদ্দ্বারা কে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে? অপরকে স্পর্শ করিলে তাহারা অশুচি হইবার ভয় করে, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অপবিত্র কে আছে?" অপর কোনও স্থানে লিখিয়াছেন, "আমি মুসলমান ও হিন্দুদিগের ধর্ম্মমত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাহারা রসনার তৃপ্তিহেতু ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। হিন্দুরা শিঙ্গাড়া ও দুগ্ধের লোভে একাদশীর উপবাস করে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-লালসা নিবন্ধন মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মুসলমানে রোজা রাখে, নমাজ পড়ে, এবং অতি প্রত্যুষে কুক্কুটের ন্যায় 'বিস্‌মিল্' বলিয়া চীৎকার করে।"

পাপ, পুণ্য ও মুক্তির বিষয়ে তাঁহার মত বৈদান্তিকদিগের মতের অনুরূপ। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সমস্ত পাপই অসত্য এবং তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। যত দিন জীব মায়ার বশীভূত থাকে, ততদিন তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। মায়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য তাহার হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করে। কবীরের মতে হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাসানুযায়ী স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই প্রকৃত মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কবীরদাসকৃত শাখীগুলি অতীব মধুর ও নীতি এবং উচ্চ ভাবপূর্ণ। অদ্যাবধি প্রায় ৫০০০ এইরূপ শাখী জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা কত ঠিক বলিতে পারা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কএকটী শাখী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১)

নব দ্বারেকা পীঁজরা, তামে পঞ্ছী পওন।
রহনেকা আচর্য্য হ্যায়, গয়ে আচম্ভা কওন॥

অন্যার্থ। নবদ্বার যুক্ত পিঞ্জর, তন্মধ্যে পক্ষী পবনরূপী। থাকাই আশ্চর্য্য, চলিয়া যাওয়া আর বিচিত্র কি ?

(২)

দুর্ব্বল কো ন সতাইয়ে, জাকী মোটী হায়।
মুয়ে খালকী শ্বাসসোঁ, সার ভসম্ হোই যায়॥

অন্যার্থ। দুর্ব্বলের হিংসা করিও না, যাহার "হায়" অতি মোটা-অর্থাৎ "হায় হায়" (বিলাপ বাক্য) অতি তেজস্কর। মৃত চর্ম্মের শ্বাসদ্বারা, সার (লৌহ) ভস্ম হইয়া যায়।

ভাবার্থ। দুর্ব্বল ব্যক্তির মন্দ করিবে না, কেন না, সে যে সজোরে হায় হায় করিবে, তাহাতে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। কর্ম্মকারদিগের ভস্ত্রা (জাঁতা) মৃত চর্ম্ম নির্ম্মিত, তাহা হইতে নির্গত হায় হায় (বায়ু) লৌহকে ভস্ম করিয়া ফেলে। অতএব, জীবন্ত চর্ম্মের ভিতর হইতে যে, বায়ু (হায় হায়) নির্গত হইবে, তাহাতে তোমার কোনও প্রকারে রক্ষা নাই।

(৩)

পোঁথী পঢ়্ পঢ়্ জগ মুয়া, পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।
একহি অক্ষর প্রেমকা, পঢ়া সো পণ্ডিত হোয়॥

অন্যার্থ। পুস্তক পড়িয়া পড়িয়া জগতের লোক মরিয়া গেল, কিন্তু কেহই পণ্ডিত হইল না। পরন্তু প্রেমের একটী অক্ষর যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত।

(৪)

চলন চলন সব কোই কহে, পহুঁচে বিরলা কোয়।
এক কনক অরু কামিনী, দুস্তর ঘাটী দোয় ॥

অন্যার্থ। "যাওয়া" "যাওয়া" (অর্থাৎ ভব সংসার পার হইয়া যাইবার কথা) সকলেই বলে, কিন্তু কদাচিৎ এক আধ জন পঁহুছিয়া থাকে। এক সুবর্ণ আর এক স্ত্রী, এই দুইটী ঘাটী অতি দুস্তর।

(৫)

মন্‌কা ফেরত যুগ গয়া, গয়া ন মন কা ফের।
করকা মনকা ছাড়িকে, মন কা মনকা ফের ॥

অন্যার্থ। মন্‌কা অর্থাৎ মালা ফিরাইতে ফিরাইতে যুগ গেল, কিন্তু মনের ফের গেল না। (অতএব) হাতের মালা ছাড়িয়া দিয়া, মনের মালা ফিরাও।

(৬)

সাঁচে আগ ন লাগহি, সাঁচে কাল ন খাই।
সাঁচেকো সাঁচা মিলে, সাঁচে মাহি সমাই ॥

অন্যার্থ। সত্যে আগুন লাগেনা, সত্য কালে খায় না, সত্য বাদীর সত্য (ঈশ্বর ভগবান্) লাভ হয়, স্বামী সত্যেরই মধ্যে।

(৭)

[ব্রাহ্মণ দিগের উপর আক্রমণের উদাহরণ।]

কলিকা ব্রাহ্মণ মসখরা, তাকো ন দীজে দান।
কুটুম সহিত নরকে চলে, সাথ লিয়ে যজমান ॥

অন্যার্থ। মাংসভোজী কলির ব্রাহ্মণ, তাহাকে দান করিও

না। সে কুটুম্বের সহিত, যজমানকে সঙ্গে লইয়া, নরকে গমন করে।

এইরূপ সহস্র সহস্র শাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যে সকল গুলিই কবীরের স্বচরিত, একথা বলিতে পারা যায় না। অনেক তাঁহার শিষ্য ও মতাবলম্বী ভক্তদিগের দ্বারা রচিত বলিয়া বোধ হয়।

কবীর দাস মনুষ্য জীবনের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা পশ্চাল্লিখিত সংগ্রহের অনুবাদ হইতে প্রতীয়মান হইবে। "ইহ জগতে মনুষ্য তাহার জন্মসূত্রে পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ পাপী ও অপবিত্র। স্বকীয় দেহের অংশ বিলুণ্ঠনাকাঙ্ক্ষী অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়। জনক জননী কহেন 'সে আমাদের পুত্র, আমরা স্বীয় স্বার্থানুরোধে তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছি।' স্ত্রী বলে 'সে আমার স্বামী' আর ব্যাঘ্রীর ন্যায় তাহাকে ছিঁড়িয়া খাইতে চায়। সন্তান সন্ততিগণ তাহার দিকে যমের ন্যায় (ভরণ পোষণের জন্য) এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গৃধ্র, কাক, প্রভৃতিরা তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। কুক্কুর শৃগাল তাহার মৃত-দেহ শ্মসানাভিমুখে যাইবে বলিয়া পথ পানে চাহিয়া থাকে। অগ্নি বলে উহাকে ভস্মরাশি না করিয়া ছাড়িব না, পৃথিবী বলে আমি উহাকে গ্রহণ করিব। বায়ু তাহার চিতাবশিষ্ট ভস্ম উড়াইবার জন্য অপেক্ষা করে। রে মূর্খ! তুই এই দেহকে তোর চিরকালের আবাস বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছিস্? তুই কি দেখিতে পাইতেছিস না যে তোর গলায় ছুরী দিবার জন্য সহস্র সহস্র শত্রু চতুর্দ্দিকে? সংসারের মায়ায় বিমোহিত হইয়া এতাদৃশ শরীরকে আপনার মনে করিতেছিস্? তোর দেহের

জন্য অসংখ্য লোকের লোভ, তোকে সমস্ত জীবন কষ্টে অতিবাহিত করিতে হইবে। রে উন্মাদ! তুই এতটুকু না বুঝিয়া এই দেহ 'আমার' 'আমার' বলিয়া চীৎকার করিতেছিস্?"

মৃত্যুর বিষয় কবীরের মনের ভাব ও বর্ণনা পশ্চাল্লিখিত উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:— "প্রিয় সারস জলাশয় পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছে। যে সরোবরে সে মুক্তা সংগ্রহ করিতেছিল এবং যাহাতে কতরূপ ক্রীড়া করিয়াছে, তাহা এক্ষণে শুষ্কপ্রায়। যে জলে কমলদল সরস ছিল, তাহা শুখাইয়াছে, কমল ম্লান বেশ ধারণ করিয়াছে। কবীর বলেন হে মানবাত্মন্! তুমি এখন গিয়াছ। আবার কবে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে?" অপিচ, "হে বন্ধো! এক্ষণে একলা যাইতেছ কেন? গাত্রোত্থান করিয়া আর একবার সংসারের লীলা খেলা দেখাও দেখি। গোধূম, ঘৃত ও শর্করাদিতে পরিপুষ্ট তোমার দেহ এক্ষণে স্বীয় বাটীর বাহিরে পড়িয়া কেন? যে মস্তকে সুন্দর উষ্ণীষ পরিধান করিতে, সেই যত্নের ধন আজ কাকের ভোজন কেন হইল? অস্থি সমূহ ইন্ধন ও কেশরাশি তৃণ গুচ্ছের ন্যায় দগ্ধ হইতেছে। আসিবার কালে একক আসিয়াছিলে, যাইতেছ ও একাকী। মধ্যে যে গৃহদ্বারে হস্তী বন্ধন করিয়াছিলে, তাহাতে তোমার কি লাভ? সংসার পিপাসার শান্তি না হইতেই এ কি ভয়ানক শার্দ্দূল তোমার উপর ঝম্প প্রদান করিল? কবীর বলেন, কালদণ্ড মনুষ্যের মস্তকোপরি সজোরে নিপতিত হইলেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় না।"

কবীরদাসের উপদেশাবলী তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই অতি আশ্চর্য্যরূপে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার

ধর্ম্মে দীক্ষিত সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান, তাঁহার বক্তৃতাদি শ্রবণ ও গ্রন্থপাঠ করিয়া, দেশে দেশে তাঁহার যশোগান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে কোনও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মত এত বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। গত শতাব্দীতে বারাণসী-রাজ চৈতসিংহ কবীরপন্থী উদাসীনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রায় ৩৫,০০০ লোককে একত্র করিয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা এখনও বৃদ্ধি হইতেছে এবং আজকাল উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের প্রত্যেক জেলাতেই সহস্র সহস্র কবীরপন্থী বৈরাগী ও গৃহস্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিখ সম্প্রদায়ের গুরু, বাবা নানক।

লাহোর জেলার অন্তঃপাতী, তালবণ্ডী নামক গ্রামে কালু ও লালু নামক দুই জন বেদী ক্ষত্রী (একজাতীয় বণিক) বাস করিতেন। কালু লালুর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইহাঁরা ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু তদ্দেশবাসী সকলেই ইহাঁদিগকে সম্ভ্রান্ত ও সৎলোক বলিয়া বিবেচনা করিত। কালু গ্রামের দলওয়াই, অর্থাৎ পাটওয়ার ছিলেন। ১৫২৬ সম্বতের অর্থাৎ ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিবস ত্রিপতার গর্ভে ইহাঁরই পুত্ররূপে বাবা নানক জন্ম গ্রহণ করেন। নানকের ভগ্নীর নাম নানকী ছিল। সুলতানপুর নিবাসী জয়রাম নামক জনৈক কৃষকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

নানকের শিক্ষার প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তিনি যে বাল্যাবস্থা হইতে অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাশালী ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই পারস্য ভাষা ও অঙ্ক শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জন্ম-সাক্ষী গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি ক্রমান্বয়ে গোপাল পাঁধা * বৈজনাথ পণ্ডিত ও কুতবুদ্দীন মুল্লার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। যৌবনাবস্থার পূর্ব্ব হইতেই ইহাঁর মন সাংসারিক ব্যাপার হইতে বিরক্ত বলিয়া বোধ হইত।

---

* পাঁধা = পাধ্যা = উপাধ্যায় ?

একদা নানক গোচারণ করিতে গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া প্রগাঢ় ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং সেই অবকাশে পশুগণ সমীপস্থ ক্ষেত্রসমূহের শস্য সকল ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ক্ষেত্রস্বামী এই ব্যাপার দর্শন করিয়া তাঁহার পিতার সহিত অতিশয় কলহ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, অপর এক দিবস দুই প্রহরের সময় তিনি অনাবৃত প্রান্তরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন ও এক বৃহদাকার সর্প স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার মুখের উপর ছায়াদান করিয়াছিল।

নানক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ৪০ মুদ্রা মূলধন দিয়া, বালারাম নামক জাট জাতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে বিদেশে প্রেরণ করেন। কিয়ৎদূর গমন করিয়া নানকের সহিত কএক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সহিত পরমার্থ বিষয়ে নানা-প্রকার কথাবার্ত্তা হওয়ায় নানকের চৈতন্যোদয় হয় যে সাংসারিক ব্যাপারে মনুষ্য জীবনের কোনই সার্থকতা নাই। সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া, যে সাধু দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তিনিই ধন্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়া নানক সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণের সহিত কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন এবং তাঁহাদিগের ভোজন, পান ও সেবায় সমস্ত মূলধন ব্যয় করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া প্রথমতঃ তিনি স্বীয় পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস না করিয়া একটী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া লুক্কায়িত থাকেন। তাঁহার পিতা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "টাকা কি করিলে?" সরল-হৃদয় নানক উত্তর করিলেন, "পিতঃ!

আপনি এই বলিয়া আমার হস্তে মুদ্রা কয়টী সমর্পণ করিয়াছিলেন যে,'যে ব্যবসায়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ বুঝিবে,তাহাতেই এই টাকা গুলি নিযুক্ত করিও।' আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে ইহলোকে সাধুসেবাজনিত পুণ্য সঞ্চয় হইতে আর অধিক লাভ কিছুতেই নাই, এজন্য তৎকার্য্যেই অর্থগুলি ব্যয় করিয়াছি। পুণ্যকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের হস্তে অর্থগুলি স্বর্গে প্রেরণ করা হইয়াছে, তথায় সুদের সহিত আমরা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইব, এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায়।"

অনন্তর নানকের পিতা তাঁহাকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, গ্রামস্বামী রায় বুলার তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন যে নানক আপনার যে অর্থ অপচয় করিয়াছে, আমি তাহা দিতেছি, আপনি উহাকে কিছু বলিবেন না। ভূস্বামী নানকের চরিত্র ও ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন এবং তিনি যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একজন ভক্তচূড়ামণি ও মহাজন হইবেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে, কালু নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে নানকের দ্বারা কোন ব্যবসায়ের কার্য্য চলিবে না। এইরূপ সংস্কারপরবশ হইয়া উহাকে সুলতানপুর নগরে স্বীয় কন্যা নানকীর বাটীতে প্রেরণ করিলেন। ভগিনীপতি জয়রাম চেষ্টা করিয়া নবাব দৌলতখাঁ লোদীর অধীনে নানকের একটী চাকরী করিয়া দিলেন এবং নবাবসাহেবের স্বকীয় সংসার ও সেনা সমূহের জন্য যে সমস্ত শস্যাদির প্রয়োজন হইত তাহার আহরণ ও বণ্টন করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। এই চাকরীর বেতন স্বরূপ নানক অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু তাহার কিছুই সঞ্চয় করিতে পারিতেন না—শেষ

কপর্দক পর্য্যন্ত সাধু, ভক্ত ও অতিথি ফকীরের সেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কেবল তাহাই নহে, বিনানুমতিতে নবাবের তহবিল হইতে অনেক টাকা এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করিতেন বলিয়া প্রভুর নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ হইয়াছিল।

যখন নানকের চাকরী উত্তমরূপ চলিতেছিল, সেই সময় তিনি গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত, বটল পরগনার অন্তঃপাতী, লিখিকো * গ্রাম নিবাসী মৌলাচৌনা নামক এক ক্ষত্রীর স্থুল-খ্‌না নাম্নী কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। চৌনা-বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে অনেক স্থলে "চৌনী" নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। কালক্রমে ঐ স্ত্রীর গর্ভে শ্রীচন্দ্‌ ও লক্ষ্মীদাস নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। এই শ্রীচন্দ্‌ বেদী ও লক্ষ্মীদাস উদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উত্তরকালে বিখ্যাত হন। পঞ্জাব প্রদেশে অদ্যাবধি ইহাঁদের অনেক আখাড়া (মঠ) বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে যে, নানক ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পর, স্বীয় বংশধরদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। এই জন্য যখন প্রচার যাত্রা করিতেন, তখন আপনার পুত্রদিগকে প্রায় সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন না। ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমতঃ তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতির অনুরোধে তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্মোপদেশ দিবার ভার নানক আপনার প্রিয় শিষ্যদিগের উপর সমর্পণ করিতেন।

---

* কোনও কোনও গ্রন্থে মৌলাচৌনার নিবাস গ্রাম "পক্ক-কারান্ধাবে" বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে।

শ্রীচন্দ্‌ ও লক্ষ্মীদাসের জন্মের অনতিকাল পরেই গুরু নানকের সংসার ধর্ম্ম হইতে মন একেবারে বিচলিত হইয়া পড়ে। ঐহিক ধন, প্রতিষ্ঠা, সামর্থ্য এবং জীবনের অকিঞ্চিৎকারিতা ও নশ্বরতার ভাব তাঁহার চিত্তকে এককালে অধিকার করিয়া লয়। ঈশ্বরের ধ্যান, ভজন ও সাধুসঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। সুলতানপুরে বাস করিবার সময়, এক দিবস "বাউ" নামক নদীতে স্নান করিতে গিয়া তিনি সমস্ত দিন জলে দাঁড়াইয়া ধ্যান মগ্ন অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন। নদীর যে ঘাটে তিনি প্রত্যহ স্নান করিতেন, উহা আজকাল শান্তি ঘাট নামে বিখ্যাত এবং স্নানান্তে যে বৃক্ষের মূলে বসিয়া ধ্যান ধারণা ও ঈশ্বর চিন্তা করিতেন, উহা কবীরবর (কবীর বট) বলিয়া পরিচিত।

অনন্তর নানক গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীনের আশ্রম গ্রহণ করিলেন। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সকলে তাঁহাকে সংসারে ফিরাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঈশ্বর প্রেমে প্রেমিকের মন কি আর সংসারের মায়ায় বিমোহিত হয়? নানকের শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য দৌলত খাঁর আজ্ঞা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু তাহাতেও ফিরিলেন না। তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সেবক নন,উত্তরে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন। স্বীয় ভগিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উদাসীনের বেশে নানক নানা দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাসকে সঙ্গে লইয়া, পিত্রালয়েগ মন করিলেন ও শ্রীচন্দ্‌ স্বীয় পিতৃস্বসা নানকীর গৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

গুরু নানকের সঙ্গে বালা ও মর্দ্দানা নামক দুই ব্যক্তি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। মর্দ্দানা ওহাবী সম্প্রদায়ের মুসলমান-ছিলেন *। এই মর্দ্দানা খঞ্জনী অথবা রবাব বাজাইতেন ও গুরু ভজন গান করিতেন। এই সময়ে নানক ঈশ্বর-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া নিমীলিত নেত্রে সংসারকে শূন্যজ্ঞান করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে যোগানন্দে মগ্ন থাকিতেন যে, মর্দ্দানাকে অনেক সময় আহার পানাভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করিয়া থাকিতে হইত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে মিলাইয়া, ধর্ম্মের এক সাধারণ ভূমিতে আনয়ন করা, বাবা নানকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই বিষয়ে তিনি যে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁহার মহান উদ্যমের ফল স্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাঁর ধর্ম্মমতের সার মর্ম্ম এই যে, ঈশ্বর এক, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নিত্য। তিনিই এই সমস্ত জীব সমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষয়িতা এবং তাঁহাতেই ইহারা সকলে অবশেষে মুক্তি লাভ করিবে। জাতি বা বর্ণের কোন অর্থ নাই এবং নানা প্রকার মত ও মার্গ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই ভ্রমসংকুল ও কল্পনাপ্রসূত। নানক পন্থীদিগের উপাসনার প্রধান অঙ্গ, জপ। আদিগ্রন্থে পশ্চাল্লিখিত মন্ত্র জপ করিবার আদেশ আছে যথাঃ—"ওঁ সত্য নাম, কর্‌তাপুরুষ, নির্ভও, নির্বৈর, অকাল মুরত, অযোনি-সম্ভব, গুরুপ্রসাদ।" অর্থাৎ

* কোনও কোনও গ্রন্থে মর্দ্দানাকে মুসলমান ডোম অর্থাৎ বাদ্যকর জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

"তাঁহার নাম সত্য, তিনি কর্ত্তাপুরুষ, নির্ভয়, শত্রুহীন, সর্ব্বকাল ব্যাপী,কাহা হইতেও জাত নহেন ও গুরুপ্রসাদলভ্য।" ব্রাহ্মণ-দিগের গায়ত্রীর ন্যায় শিখমাত্রেই প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। অনেকে বাবা নানককে কবীরদাসের অনুগামী বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে কবীরপন্থীদিগের একটী শাখা মাত্র বিবেচনা করেন। নানকের মতাবলম্বীরা তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং পঞ্জাব প্রদেশে তাঁহার মহত্ত্ব অদ্যাবধি অপ্রতিহত রহিয়াছে। সমস্ত শিখ জাতিই তাঁহার শিষ্য ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের পক্ষ-পাতী। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, গুরু নানকের জীবন-চরিত পাঠ করিলে তাঁহাকে একজন অতীব মহানুভব ও উচ্চদরের প্রতিভাশালী উদাসী ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

গুরু নানক অনেক তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া এবং অনেকানেক নরনারীর মনে আপনার ধর্ম্মমত সমূহ প্রোথিত করিয়া, ১৫৯৬ সম্বতে (১৫৩৯ খৃঃ অঃ) পরলোক প্রাপ্ত হন। ইহাঁর শিষ্যের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতীয় লোকই ছিল। কবীরদাসের ন্যায় ইহাঁরও মৃতদেহ কতক লোকে দগ্ধ, ও কতক লোকে সমাহিত করিতে চায়। এই উপলক্ষে নানকের হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদিগের মধ্যে তুমুল কলহ সমুপস্থিত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিবাদ বিসম্বাদের পর, যখন সকলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, তখন জানিতে পারিল যে, মৃতদেহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কেহ উহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে অথবা কোন অলৌকিক নিয়মদ্বারা উহা শূন্যে পরিণত হইয়াছে। অনন্তর, যে বস্ত্র দ্বারা

দেহ আবৃত ছিল, উহা দুই খণ্ড করিয়া, হিন্দুরা এক খণ্ড দাহ ও মুসলমানেরা অপর খণ্ড সমাহিত করিলেন।

অনন্তর শিষ্যেরা নানকের উপদেশসমূহ একত্র করিয়া "আদি গ্রন্থ" নাম দিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিলেন। ইহার একশত বৎসর পরে গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখ-ধর্ম্মের অপর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত গুরুশাখী নামক গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে লিখিত আছে। কিন্তু উহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কেবল অলৌকিক আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ।

ইহার পর, নানকের নাম সমস্ত দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। মুসলমানেরা ইহাঁকে নানক শাহ নামে অভিহিত করেন এবং হিন্দুরা গুরু নানক, বাবা নানক ও নানক নিরংকারী বলিয়া তাঁহার যশোগান করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য ধনহীনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মজীবন ও প্রতিভাবলে এরূপ মহত্ত্ব লাভ করেন, তাঁহার প্রশংসার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া লোকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময়ে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে না। জনপ্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যৎকালে নানকের জন্ম হয়, তখন সূতিকাগৃহ-বাসিনী ধাত্রী শ্রবণ করে যে, শূন্যমার্গে বহুলোক একত্র হইয়া যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, "পৃথিবীতে অদ্য একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন।" ঐ স্থানে আজ কাল একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে উহাকে "নানকানা" বলিয়া উল্লেখ করে। যে স্থানে নানকের মুখের উপর সর্পে ফণা ধরিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, তাহার এক্ষণে "কৈস সাহেব" নাম হইয়াছে।

গুরু নানকের বিষয় দুই একটী আখ্যায়িকা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পশ্চাল্লিখিত গল্পটী বাঙ্গালা ও বিহার অঞ্চলের নানক-পন্থী-সাধুদিগের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়ঃ—পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সুলতানপুরে অবস্থান কালীন কিছুদিনের জন্য নানক নবাব সুলতান খাঁ লোদীর অধীনে শস্য বণ্টকের কার্য্য করিতেন। এক দিবস তিনি কোনও ব্যক্তির জন্য গোধূম মাপিতে ছিলেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই রীতি আছে যে, শস্য পরিমাপকেরা মাপ করিবার সময়, উহার সংখ্যা না ভুলিয়া যায়, এই অভিপ্রায়ে রাম শব্দ যোগ করিয়া, উহা বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকে। এই নিয়মানুসারে নানক "একে রাম, একে রাম, একে রাম, একে——", "দুইএ রাম, দুইএ রাম, দুইএ রাম, দুইএ——", এইরূপ বলিয়া গোধূম মাপিতে ছিলেন। যথন ত্রয়োদশ বার মাপা হইয়াছে, তথন গোধূম ফুরাইয়া গেল। ভৃত্য বালারামকে গুরু কহিলেন,"আরও লইয়া আইস"। বালা ভাণ্ডার হইতে অতিরিক্ত গোধূম আনিতে গেলে, তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটে। সুতরাং পরিমিত সংখ্যা ভুলিয়া না জান, এইজন্য নানককে বারংবার "তেরা রাম,তেরা রাম,তেরা রাম,তেরা——" এইরূপ বলিতে হয়। এক্ষণে হিন্দী ভাষায় "তেরা" শব্দের অর্থ একদিকে "ত্রয়োদশ" ও অন্যদিকে "তোমার"। অতএব ক্রমাগত "তেরা রাম, তেরা রাম" বলিতে বলিতে নানকের হঠাৎ জ্ঞানোদয় হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আমি বারম্বার বলিতেছি "তেরা রাম, তেরা রাম—তেরা" অর্থাৎ "(আমি) তোমার রাম, তোমার রাম—তোমার" কিন্তু বাস্তবিক রহিয়াছি "সংসারের"।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার মন রামপ্রেমে মাতিয়া উঠিল, আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পরিমাণ পাত্র ও শস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একদিন নবাব দৌলত খাঁ মুসলমানদিগের সহিত নানক শাহকে মস্‌জিদে উপাসনা করিতে লইয়া যান। সকলে জানু পাতিয়া মস্তক ভূমিতে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু নানক চুপ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া নবাব বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাহজী! আমরা সকলে জানুপাতিয়া প্রণাম করিতেছি, আপনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন?" নানক উত্তর করিলেন, "নবাব সাহেব! আপনি মনে মনে কান্দাহারী ঘোড়ার বিষয় ও কাজী মহাশয় স্বীয় কন্যার পীড়ার কথা ভাবিতেছিলেন। বলুন দেখি, আপনারা ঈশ্বরের নিকট কি প্রার্থনা করিলেন?" নবাব ও কাজী এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, 'কি আশ্চর্য্য! আমাদের মনের কথা নানক কিরূপে জানিতে পারিল।' অতঃপর উভয়েই স্বীকার করিলেন যে, তাঁহাদের মনের কথা প্রকৃতরূপে কথিত হইয়াছে।

যৎকালে বাবর শাহ হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, সেই সময়, অনেক দীন দুঃখী লোককে বেগারী ধরা হয়। এই সঙ্গে নানকও অপরিচিতভাবে ধৃত হইয়া বাদশাহের সমক্ষে নীত হন। অনেক প্রকার কথাবার্ত্তার পর, নানক বাদশাহকে কহিলেন যে, আপনার বংশধরগণ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে বসিবেন। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

কেননা, হিউমায়ুন হইতে সপ্তম পুরুষের পর ভিন্নবংশীয় ফরোক-শিয়র রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

নানকের দোষের মধ্যে এই টুকু মাত্র দেখিতে পাওয়া যাইত যে, তিনি স্বীয় মতের নিরতিশয় পক্ষপাত বশতঃ ব্রাহ্মণ ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের প্রতি কথঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে কথনও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। কোনও সময়ে নানক মক্কা ও মদিনায় তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এক দিবস, মক্কা নগরের মস্‌জিদের দিকে চরণদ্বয় প্রসারিত করিয়া শয়ন করিতে দেখিয়া, কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলে, "মহাশয়! এরূপ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।" এই কথা শুনিয়া নানক উত্তর করিলেন, "নির্ব্বোধ! ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী। যে দিকে পাদ প্রসারণ করিবে, সেই দিকেই তিনি রহিয়াছেন। তাহার উপায় কি?"

নানক নানাবিধ লাবনী ও ভজন রচনা করিয়া তাহার গান করিয়া ভ্রমণ করিতেন। এই সমস্ত সঙ্গীত অতীব সুমধুর ও উচ্চ ভাবপূর্ণ এবং ইহাদের সংখ্যা অগণ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার বিরচিত দুই একটী ভজন এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১)

রাগ ধনাসরী মহলা।

কাহেরে বন খোজন জাঈ?

সরব নিবাসী সদা অলেপা তোহী সংগ সমাঈ। ১।

রহাউ। পুহুপ মধ্য জিউ বাস বসতু হ্যায়, মুকুর মাঁহি জস ছাঁঈ।

ত্যায়্সে হী হরি বসৈ নিরন্তর, ঘটহী খোজহু ভাঈ। ২।
বাহর ভীতর একৈ জানহু য়হ গুরু জ্ঞান বতাঈ।
জন নানক! বিন্ আপা চীহ্নে মিটে ন ভ্রমকী কাঈ। ৩।

অস্যার্থ। কিসের জন্য বনে অন্বেষণ করিতে যাও? সর্ব্ব নিবাসী সদা নির্লিপ্ত ভাবে তোমাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। ১।

পুষ্পের মধ্যে যেমন গন্ধ ও দর্পণের মধ্যে যেমন ছায়া অবস্থান করে,হরিও সেইরূপ প্রত্যেক জীবের মধ্যে বাস করিয়া থাকেন, সেখানে তাঁহার অন্বেষণ কর। ২।

অন্তর্বাহ্য একই প্রকার জানিবে, গুরু এই জ্ঞান বলিয়াছেন। হে নানক দাস! ঈশ্বরকে না চিনিতে পারিলে, ভ্রমের মলিনতা অন্তর্হ্র্ত হয় না। ৩।

(২)

রাগ গৌড়ী মহলা।

সাধো! মনকা মান তিআগউ।
কাম, ক্রোধ, সঙ্গতি দুর্জনকী, তাতেঁ অহনিশি ভাগউ। ১।
রহাউ। সুখ্ দুখ্ দোনোঁ সমকর জানৈ, অউর মান অপমানা।
হরষ শোকতেঁ রহেঁ অতীতা, তিন জগ তত্ত্ব পছানা। ২।
[অ]স্তুতি নিন্দা দোউ তিআগে, খোজে পদ নির্ব্বাণা।
জন নানক! য়হ্ খেল্ কঠিন হ্যায়,কিন্হুন গুরুমুখ জানা।৩॥

অস্যার্থ। হে সাধো! মনের অভিমান পরিত্যাগ কর। কাম, ক্রোধ, ও দুর্জ্জনের সংসর্গ হইতে অহর্নিশি দূরে পলাইয়া যাও। ১।

যে ব্যক্তি সুখ-দুঃখ ও মান-অপমান সমান বলিয়া জানেন, হর্ষ-শোক হইতে অতীত থাকেন, এবং যিনি স্তুতি-নিন্দা উভয়ই ত্যাগ করিয়া, নির্ব্বাণ পদ অন্বেষণ করেন, তিনিই ত্রিলোকের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। হে নানক দাস! সংসারের ক্রীড়া কঠিন; কয়জন গুরূপদেশ জানিয়াছেন? ২, ৩।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরব্রহ্মের আরতি-ব্যঞ্জক বাবা নানকের সুবিখ্যাত সঙ্গীত নিম্নে প্রকটিত হইল। ইটী গুরুমুখী ভাষায় বিরচিত। ইহার শব্দবিন্যাসের লালিত্য, স্বাভাবিক ওজস্বিতা এবং অন্তর্নিহিত কবিত্বের মাধুর্য্য দূরদেশবাসী বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয়কেও মাতাইয়া তুলে।

রাগ ধনাসরী মহলা।

গগণ মৈ থালু, রবচন্দ দীপক বনৈ,
তারকামণ্ডলা জনক মোতী।
ধূপ মলেয়ানিলো, পবন চৌরো করি,
সকল বনরাঈ ফুলন্ত জ্যোতী॥
কৈসী আরতি হোই ভব-খণ্ডনা তেরী
আরতি, অনহতা শবদ বাজন্ত ভেরী॥
রহাউ। সহস তব নৈন, নন নৈন হহি
তোহিকউ সহস মুরতি, ননা এক তোহি।
সহস পদ বিমল নন এক পদ গন্ধ
বিনু সহস তব গন্ধ ইব চলত মোহি।
সভমহি জোত্ জোত্ হৈ সোই।
তিস্‌দে চানন সব মহি চানন হোই,

গুর্ সাখী জ্যোত্ পরগট হোই,
জো তিস্ ভাবৈ সো আরতি হোই।
হরি-চরণ-কমল-মকরন্দ-লোভিত মনো
অনদিনো মোহি য়াহী পিয়াসা।
কির্পা জল দেহু নানকসারঙ্গকউ,
হোই জাতে তেরই নাঁউ বাসা।

অস্যার্থ। গগণ স্বরূপ থালে, সূর্য্য ও চন্দ্র দীপ হইয়াছে। মলয়ানিল ধূপ বলিয়া অনুমিত হইতেছে ও পবন চামর ব্যজন করিতেছে। বনরাজি প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন! তোমার কেমন আরতি হইতেছে! অনাহত শব্দ সমূহ ভেরী বাজাইতেছে।

রহাউ। তোমার সহস্র নয়ন, আবার একটীও নয়ন নাই; সহস্র মুর্ত্তি, কিন্তু একটীও মুর্ত্তি নাই; সহস্র চরণ তোমার, অথচ তুমি চরণহীন; সহস্র সহস্র গন্ধে তুমি আমোদিত, আবার তুমি নির্গন্ধ। সকলের মধ্যে যাহা জ্যোতি,তাহাই তাঁহার জ্যোতি,যে প্রকাশ সকলের, তাহা তাঁহারই প্রকাশ। গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হইলে এই জ্যোতি প্রকাশিত হয়। যখন কোনও ভক্ত এইরূপ ভাবেন, তখনই তাঁহার আরতি হয়। হরিচরণ-কমল-মকরন্দ-লুব্ধ আমার মন; অনুদিন আমি তাহার নিমিত্ত পিপাসিত; নানক চাতককে কৃপা জল প্রদান কর, যদ্দ্বারা তোমার নামের মধ্যে আমার বাস হয়।

এইরূপ সহস্র সহস্র ভজন ও শাখী পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর, মধ্য-

ভারত ও বিহারের সর্ব্বস্থলে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গীত হইয়া তত্রত্য গৃহী ও উদাসী শ্রোতৃকুলকে অদ্যাপি প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাসে বিমোহিত করিয়া থাকে।

আজকাল পঞ্জাব প্রদেশের অধিকাংশ লোককেই বাবা নানকের প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায়।

গোঁসাই তুলসী দাস।

গোঁসাই শ্রীতুলসীদাসের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। পশ্চিমোত্তর দেশীয় হরিভক্ত সাধু-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর কবিত্ব শক্তি অতি উচ্চ দরের ছিল। হিন্দী ভাষাতে ত তুলসীদাসের সুললিত কবিতাবলী অদ্যাবধি অতুলনীয়ই রহিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃত ছাড়া আর কোনও ভারতীয় ভাষাতে এতাদৃশ সুমধুর কবিতা কেহই রচনা করিতে পারেন নাই, এরূপ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার অনুপম রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে তুলসীর উপমাদি অলঙ্কারের ছটা কালিদাসের উপমা হইতে কোনও অংশেই ন্যূন নহে। আবার বৈষ্ণব কবিদিগের কাব্য-সমূহে গভীর ভাবাত্মক যে সমস্ত অমূল্য প্রেমাদি রসের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তকবি তুলসীদাসের প্রতি পংক্তিতে তাহার প্রাচুর্য্য অবলোকন করিয়া পাঠকের মন মাতিয়া উঠে। বঙ্গদেশের কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মহাপুরুষের নাম পরিচিত; কিন্তু বিহার, উত্তর-পশ্চিম ও যে যে দেশে হিন্দী ভাষা কথিত হয়, সেই সকল স্থানে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের নিকটেই তুলসী চিরপরিচিত ও প্রাতঃস্মরণীয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ ভগবদ্ভক্ত কবির রীতিমত জীবনচরিত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তমাল ও অপরাপর অলৌকিক আখ্যায়িকাপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থসমূহ

এবং জনপ্রবাদ হইতে যতদূর সংকলন করিতে পারা গিয়াছে, তাহার সারাংশ এই সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করা হইল। ভরসা করি, তৎপাঠে অনেকেই আপনাদিগকে ব্যর্থশ্রম বিবেচনা করিবেন না।

অন্তর্বেদীর অন্তঃপাতী তরী নামক গ্রামে * শুক্ল ঔপাধিক এক কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের গৃহে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কিন্তু কথঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকাতে প্রথমতঃ তাঁহাকে সাংসারিক কষ্টাদি ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে তিনি কাশীর রাজার মন্ত্রী হইয়া বারাণসীতে বাস করেন। অগ্রদাসের শিষ্য জগন্নাথ দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। যৌবনাবস্থায় এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি কিছু দিনের জন্য সাংসারিক সুখভোগে কালাতিপাত করেন। এই সময়ে তুলসীর একটী পুত্র সন্তান জন্মে। তুলসীদাস স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এমন কি, তাঁহাকে ছাড়িয়া তিনি কোথাও এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না। অবশেষে এই স্ত্রীই প্রকারান্তরে গোঁসাইজীর বৈরাগ্যের কারণস্বরূপা হইয়াছিলেন।

গৃহিণী এক দিবস স্বামীর অনুপস্থিতি কালে তাঁহাকে না বলিয়া স্বীয় পিত্রালয়ে গমন করেন। তুলসী বাটীতে প্রত্যাগমন

---

* পণ্ডিতবর স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে তুলসীদাসের জন্মস্থান চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী রাজপুর গ্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যত্র সকল স্থলেই এই প্রবন্ধলিখিত গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

করিয়া দেখেন যে গৃহ শূন্য, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তিনি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, কাহাকেও না বলিয়া কহিয়া তিনি স্বীয় পিতৃগৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রণয়িনীর বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পরিয়া, তুলসীদাস তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া প্রথমতঃ ভারতকুলনারীর স্বভাবোচিত লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। অতঃপর তাঁহাকে একাকী পাইয়া—"এক দিনও স্ত্রীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না! অঞ্চল ধরিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে হয়? ছিঃ!" এই বলিয়া অনেক নিন্দা ও ভৎর্সনা করিলেন। তিনি কহিলেনঃ—

লাজ ন লাগত আপুকো, ধোরে আয়েহু সাথ।
ধিক্ ধিক্ অয়্সে প্রেমকো, কহা কহোঁ মৈ নাথ॥
অস্থি চর্ম্মময় দেহ মম, তামো জৈসী প্রীতি।
তৈসী জো শ্রীরাম মহ, হোত ন তও ভবভীতি॥

অস্যার্থ।

লজ্জা নাই আপনার, দৌড়িয়াছ সাথ।
ধিক ধিক হেন প্রেমে, কি কহিব নাথ।
অস্থি চর্ম্মময় দেহ হয় হে আমার,
তাহাতে যেরূপ প্রেম দেখি হে তোমার।
সেরূপ শ্রীরামে যদি হইত হে প্রীতি,
কখনই থাকিত না তবে ভবভীতি।

স্ত্রীর মুখ হইতে এই কথা শুনিবামাত্র তুলসীদাসের চৈতন্য হইল। তত্ত্বজ্ঞানের হুতাশন এককালে হৃদয়ের মধ্যে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। "তুমি যথার্থ বলিয়াছ", সহধর্ম্মিণীকে এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় চলিলেন? তরী গ্রামে স্বীয়গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে কি প্রণয়িণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন? স্বামীর আকার প্রকার দেখিয়া পতিব্রতা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হওয়াতে তিনি সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন। আর কি করেন, ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "ফিরিয়া আইস! ফিরিয়া আইস! আমি অন্যায় বলিয়াছি। আইস, আহারাদি করিয়া দুই জনে একত্র হইয়া আপনাদের গৃহে ফিরিয়া যাই।" কিন্তু তুলসীর চিদাকাশে-প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, অবলা কামিনীর সান্ত্বনা বাক্য-রূপ তালবৃন্তের মৃদু বায়ুর হিল্লোল তাহাতে অনুভূত হইবে কেমন করিয়া? হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত, স্ত্রীলোকের সাংসারিক সুখ-ব্যঞ্জক প্রলোভনবচনে তাঁহার কি করিবে?

অনন্তর তুলসীদাস, ধন সংসার ও স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তবৎসল, সর্ব্বগুণাভিরাম, ভুবনমোহন শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐস্থানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিয়মানুসারে তিনি প্রথম দিন উপবাসী থাকিয়া রাম লক্ষ্মণাদি দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেড়াইলেন। সমস্ত দিন অনাহারে ভ্রমণ করিয়া এবং ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তত্ত্ব কথা সকল আলোচনা করিতে করিতে রাত্রিকালে নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার পিতা সম্মুখে উপস্থিত

হইয়া বলিতেছেন, "বৎস ! তুমি সর্ব্বদুঃখহারী ভবসমুদ্রের কাণ্ডারী ব্রহ্মরূপী শ্রীরামচন্দ্রের নাম সাধন কর।" প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তুলসীদাস সরযূতে স্নান করিয়া আসিলেন, এবং একান্ত মনে সুখাসীন ও নিমীলিত নেত্র হইয়া অনবরত রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময় এক জন অপরিচিত বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহাকে এক গাছি তুলসীর মালা দিয়া উহার সাহায্যে জপ করিতে উপদেশ করিলেন। পরে কিছুদিন অযোধ্যার বাস করিয়া গোঁসাইজী পুনরায় বারাণসী নগরে প্রস্থান করেন।

কাশীর প্রান্তে অসীঘাটের উপর বালার্ক-কুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। উহার সমীপে তুলসীদাসের আশ্রম অদ্যাবধি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে গঙ্গাতীরে একটী মঠ দৃষ্ট হয়। উহার মধ্যে হনুমানের মূর্ত্তি ও তুলসীদাসের ভজন সাধন করিবার চিহ্ন সমুদায় এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গঙ্গার এই ঘাটটী তুলসীঘাট নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, তুলসীদাস জীবিতাবস্থায় এই স্থানে বাস করিতেন। যাচ্ঞা না করিয়া যাহা অনায়াসে পাইতেন, তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন এবং বাল্মিকী রামায়ণ পাঠ ও রাম চরিত্রের আলোচনা করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। ইহাও জানিতে পারা যায় যে, কিছু দিনের জন্য তিনি সোরণ নামক গ্রামে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তুলসীদাসের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অতি উচ্চ দরের পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন কালীয় বিদ্যালোচনার প্রধান স্থান কাশীধামে সজ্জনসমূহের সংসর্গে থাকিয়া ভগবানের কৃপায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হিন্দী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিবার তাঁহার বিলক্ষণ সামর্থ্য জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরারাধনা ও প্রেমের সহিত রামায়ণ পাঠ করিয়া গোঁসাইজী কালক্ষেপণ করিতেন। এক দিন রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম দাশরথী রামচন্দ্র ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশ করিতেছেন, "তুমি হিন্দী ভাষায় রামায়ণ রচনা কর।" তুলসীদাস প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিন হইতে রামায়ণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন ও ঈশ্বর-কৃপায় উপযুক্ত সময়ে উহা সমাপন করিলেন। এই রামায়ণই তুলসী দাসের প্রধান স্মৃতি-চিহ্ন। কথিত আছে যে খৃষ্টীয় শকের ১৬৩১ সালে তিনি এই উপাদেয় গ্রন্থ বিরচণ করিতে আরম্ভ করেন। রামায়ণ ভিন্ন গোঁসাই তুলসীদাস রামগুণাবলী, গীতাবলী, দোহাবলী, কবিত্বরামায়ণ, বরওএ রামায়ণ, বিনয়পত্রিকা, ছন্দাবলী, শতসই আদি কয়েক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কোনও কোনও লোকের মতে রামশলাকা, হনুমান বাহুক, জানকীমঙ্গল, পার্ব্বতী মঙ্গল, রোলাছন্দ ও ঝুলনাছন্দ নামক কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থও তাঁহারই কর্ত্তৃক প্রণীত। তুলসীদাসকে অনেক লোকে বাল্মীকির অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে কলিযুগে অনেক ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ হইবেন। তাঁহাদের এবং স্ত্রী শূদ্রাদি সকলের যাহাতে রামচরিত্র পাঠ করিয়া পরিত্রাণ লাভের সুযোগ হয়, এই অভিপ্রায়ে লোকহিতেচ্ছু মহর্ষি বাল্মীকি তুলসী বিপ্রের অবতার রূপে এই মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া ভাষা রামায়ণ প্রণয়ন করেন।

তুলসী দাসের জীবনীতে অনেকানেক অদ্ভূত ও হিতগর্ভ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলির মধ্যে যদিও বিস্তর অলৌকিক ও অসংলগ্ন কথার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহার

অন্তঃসার গ্রহণ করিতে পারিলে অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। আমরা এস্থলে ঐ সকল আখ্যায়িকার মধ্যে দুই চারিটী বর্ণন করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

গোঁসাইজীর এই একটী নিয়ম ছিল যে, তিনি কদাপি কাশী-ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেন না। এই জন্য শৌচাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতি দিন অসী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে অনেক দূর যাইতে হইত। প্রত্যাবর্ত্তন কালে ভৃঙ্গার মধ্যে যে অবশিষ্ট জলটুকু থাকিত, অপবিত্র জ্ঞানে উহা কাশীতে আনয়ন না করিয়া নদীপারেই এক আম্রবৃক্ষমূলে নিক্ষেপ করিতেন। কথিত আছে, স্বকীয় কর্ম্মফলানুবর্ত্তী এক পিশাচ ঐ বৃক্ষোপরি বাস করিত। সে এক দিন গোঁসাইকে একাকী পাইয়া অতীব বিনীত ভাবে তাঁহাকে কহিল, "হে ব্রাহ্মণ! আপনি আমাকে অনেক জল পান করাইয়াছেন, ইহাতে আমি আপনার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। আপনি আমার নিকট অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করুন।" ভয়হীন তুলসী জিজ্ঞাসা করি-লেন, "আপনি কে, এবং কিসের জন্য এখানে অবস্থান করিতে-ছেন?" প্রেত উত্তর করিল, "আমি পূর্ব্ব জন্মে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটস্থ কোন এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ছিলাম। তথাকার রাজা আমার যজমান ছিলেন। এই জন্য তদ্দেশে আমার অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু সাতিশয় লোভ বশতঃ পুণ্যের জন্য রাজা যাহা কিছু দান করিতেন, আমি তাহার সকলি স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতাম, অন্যান্য ব্রাহ্মণ বা দীন দুঃখীকে তাহার কিছুই দিতাম না। ইহাতে সাধু শান্ত প্রভৃতির সহিত আমার সর্ব্বদাই বিরোধ হইত এবং আমি মিথ্যা করিয়া রাজসমীপে সেই সকল মহাপুরুষের

নিন্দা করিতাম। আপনার আত্মীয় স্বজন—পাত্রই হউক আর অপাত্রই হউক—আমার চক্রান্তের প্রভাবে রাজদ্বারে বিপুল দানাদি প্রাপ্ত হইত। আমার জীবন কপটতাপূর্ণ ছিল। আমি কায়-মনোবাক্যে কখনও কাহারও উপকার করিতাম না। দৈবাধীন পিপাসার্ত্ত এক দুঃখী ব্রাহ্মণ এক দিন আমার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমি উহাঁকে তাহা দিয়াছিলাম। মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া, বোধ হয়, এই একটী মাত্র সৎকার্য্য আমাকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই পুণ্যবলে এক্ষণে আপনার নিকট আমি প্রত্যহ পানীয় জল প্রাপ্ত হইতেছি।"

গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বিন্ধ্যাচলবাসী ছিলেন, এস্থানে কেমন করিয়া আসিলেন?" পিশাচ কহিল, "এক সময়, আমাদের রাজা কাশীযাত্রা করেন; তাঁহার সঙ্গে আমিও আসিয়াছিলাম। এই বৃক্ষতলে পঁহুছিবামাত্র হটাৎ এক কালসর্প আমাকে দংশন করিল এবং তাহাতেই আমার প্রাণত্যাগ হইল। মৃত্যুর পর, একদিকে যমদূত ও অন্যদিকে শিবদূতগণ আমাকে লইতে আসিলেন। যমদূতগণ বলিতে লাগিলেন, 'এ ব্যক্তি অতিশয় পাপী, আমরা ইহাকে নরকে লইয়া যাইব।' মহাদেবের দূতগণ ইহাতে সম্মত না হইয়া কহিতে লাগিলেন, 'না, এই মনুষ্য কাশী আসিবার মানসে গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। যদিও মহাপাপী বলিয়া কাশী পর্য্যন্ত পঁহুচিতে পারে নাই বটে, তথাপি কাশীর মার্গে উহার দেহনাশ হইয়াছে, অতএব মহাতীর্থের মহিমাবলে তোমরা উহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিবে না। এ ব্যক্তি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানেই থাকিবে। এবং ক্ষুধা, পিপাসা ও স্বকীয় কর্ম্মানুযায়ী

ফলভোগ করণানন্তর গভীর যাতনা সহ্য করিয়া তাহার পর কোন হরিভক্ত ব্রাহ্মণের জলপানদ্বারা মুক্তিলাভ করিবে।' এই নিমিত্ত হে বিপ্রবর! কাশীর মহিমাবশতঃ আমাকে এই স্থানেই এতদিন বাস করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আপনার দত্তজলপান করিয়া পিশাচযোনি হইতে মুক্তিলাভ করিব।"

তুলসীদাস বলিলেন, "হে প্রেত! যদি বরদানে নিতান্তই কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে সপরিবার রামচন্দ্রকে দেখাইয়া দেও।" পিশাচ উত্তর করিল, "রামচন্দ্রকে দেখাইবার সামর্থ্য আমার নাই, তবে যে উপায়দ্বারা তাঁহার দর্শন হইতে পারে, তাহা আপনাকে বলিয়া দিতেছি। অমুক স্থানে, এক মন্দিরমধ্যে রামায়ণের কথা হইয়া থাকে। কথা শুনিবার জন্য সে স্থানে দীনহীন মলিনবেশধারী এক ব্যক্তি সকলের অগ্রে উপস্থিত হন এবং সর্ব্বশেষে চলিয়া যান। ঐ ব্যক্তি রামভক্ত হনুমান। তিনি ছদ্মবেশে আগমন করিয়া প্রত্যহ স্বীয় ইষ্টদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া থাকেন। কথা শেষ হইলে, আপনি তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া তাঁহার চরণধারণ করিয়া প্রার্থনা করিবেন। ইচ্ছা হইলে, তিনি আপনাকে সপরিবার শ্রীরামচন্দ্র দেখাইতে পারেন।" এই বলিয়া প্রেতরূপী ব্রাহ্মণ কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ও ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন। তুলসীদাসও স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান, পূজা ও আহারাদি সমাপনানন্তর যথা সময়ে কথা স্থানে যাত্রা করিলেন।

তুলসীদাস কথা স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তথায় দীন দুঃখী দরিদ্র একটী মাত্র শ্রোতা উপস্থিত আছেন। দেখিতে দেখিতে

সভাস্থল জনপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং পৌরাণিক কথক আগমন করিলেন। তদনন্তর কথা আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণের পর, কথা শেষ হইলে, সেই দরিদ্র ভিন্ন আর সকল লোক তথা হইতে চলিয়া গেল এবং তুলসীও বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঐ ব্যক্তি সভা হইতে বহির্গত হইলেন। গোঁসাই তুলসীদাস কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। কিয়দ্দূর গমন করিয়া যখন দেখিলেন, তথায় আর কেহ নাই, তখন দ্রুত পদে সেই দরিদ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও কহিলেন, "আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আপনি রামভক্ত হনুমান।" মহারুদ্রাবতার রামকিঙ্কর, তুলসীর বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রার্থনা কর ?" গোস্বামী উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আপনি সমর্থ, স্বগণসহ শ্রীরামচন্দ্রকে আমার দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" অনন্তর দয়াবান্ হনুমান কহিলেন, "তুলসী! তুমি চিত্রকূটে যাও, সেখানে অখিল ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি রামচন্দ্রকে স্বগণসহ দেখিতে পাইবে।" এই কথা বলিয়া হনুমান অন্তর্হত হইলেন।

হনুমানকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তুলসীদাস নিরতিশয় আহ্লাদিতান্তঃকরণে চিত্রকুট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তীর্থযাত্রাসম্বন্ধীয় যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা সমাপন করিলেন। একদা, ঐ গ্রামের রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়, দেখিতে পাইলেন এক স্থানে রামলীলার অভিনয় হইতেছে। ঐ দিন দশমীর লীলা হইতেছিল। তুলসীদাস দেখিলেন, রামচন্দ্র রাবণকে পরাভূত

করিয়া লঙ্কার রাজত্ব বিভীষণকে অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং লক্ষ্মণ, জানকী ও হনুমান প্রভৃতি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। এই সমস্ত অভিনয় দর্শন করিয়া তুলসীর মন মোহিত হইয়া গেল। অনন্তর যৎকালে তিনি স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধারী হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া তুলসী বলিলেন, "এই গ্রামে কেমন সুন্দর রামলীলার অভিনয় হইতেছে!" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? আজ কাল রামলীলা কোথায়? এ গ্রামে কেবল আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে রামলীলা হইয়া থাকে; এ ত রামলীলার সময় নহে!" এই কথা শুনিয়া গোঁসাইজী দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "কি? আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, আর তুমি বলিতেছ যে এখন লীলার অভিনয় হইতেছে না। আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব।" এই বলিয়া দুই জনে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, লীলাভিনয়ের কোন চিহ্নই নাই। তুলসীদাস বিস্মিত হইয়া তৎস্থাননিবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "এই মাত্র যে রামলীলার অভিনয় দেখিয়া গেলাম, তাহা কোথায় গেল? আপনারা ত সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অভিনয় হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানকার সকল লোকে হাসিয়া কহিলেন, "আজকাল লীলা কোথায়? তোমার মনোমধ্যে কিছু ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবে।"

এই কথা শুনিয়া তুলসীর মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া গিয়া ছিলেন, তাহার সকলই

অলীক! এ কি মায়াপুরী, না ইন্দ্রজালের প্রভাব? অনেকক্ষণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বারাণসীতে তাঁহাকে হনুমান যে রামদর্শনের কথা বলিয়াছিলেন, হঠাৎ সে সমস্ত তাঁহার স্মরণপথে আরূঢ় হইল। তখন দরদরিত ধারে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে তুলসীদাস বলিতে লাগিলেন, "হায়! ভক্তবৎসল ভগবান্ আমাকে দর্শন দিলেন, কিন্তু আমার বুদ্ধি মলিন হইল বলিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রভুকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার পর্য্যন্তও করিতে অক্ষম হইলাম!" এই চিন্তায় অভিভূত হইয়া তুলসী সে দিবস ভোজনপানাদি কিছুই করিলেন না। রাত্রিকালে যখন নিদ্রা আসিল, তখন স্বপ্নে দেখিলেন, যেন হনুমান তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুলসী! তুমি সকল চিন্তা পরিহার করিয়া এক্ষণে রামরূপী শ্রীহরির চরণের আশ্রয় লও এবং তাঁহার ভজনা কর।" এই প্রকার রামদর্শন করিয়া তুলসীদাস কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও প্রতিদিন প্রেমোন্মত্ত চিত্তে রামভজন করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা, কোনও নরঘাতী পাপিষ্ঠ তুলসীদাসের কুটীরদ্বারে আসিয়া, "রাম রাম" বলিয়া ভিক্ষা চাহিল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" ভিখারী উত্তর করিল, "আমি মহাপাতকী, ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। আমি অতিশয় ক্ষুধিত, কিঞ্চিৎ অন্নদান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।" গোস্বামী বলিলেন, তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া, প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার "রাম রাম" বলিয়া আইস, তৎপরে দুই জনে একত্র ভোজন করিব।' হত্যা-

কারী, তুলসীদাসের উপদেশানুসারে রাম নামে বিশ্বাস করিয়া, সেইরূপ করিল। তৎপরে উভয়ে এক পাত্রে ভোজন করিলেন।

অনন্তর বৈষ্ণব-চূড়ামণি তুলসীদাস নরহন্তা পাপাত্মার সহিত একত্রে আহার করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া, নিকটবাসী সমস্ত লোকই বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সকলে গোস্বামীর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া কহিল যে, "আপনি মহাত্মা হইয়া এ কিরূপ কার্য্য করিলেন?" তুলসীদাস উত্তর করিলেন, "আপনারা সকলে অতীব বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান বটেন, কিন্তু রামনামের প্রকৃত মাহাত্ম্য এখন পর্য্যন্তও বুঝিতে পারেন নাই। এই ব্যক্তি রাম নামের মহিমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, তবে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়া এ বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন।"

অবশেষে সকলে স্বীকার করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, যদি এই ব্যক্তির প্রদত্ত তৃণ মন্দিরস্থ গো সকল ভক্ষণ করে ও ইহার স্পৃষ্ট অন্ন নন্দীবৃষ গ্রহণ করে, তাহা হইলে জানিব যে এ নিষ্পাপ হইয়াছে।" এই বলিয়া সকলে একত্র হইয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলেন এবং ঐ ব্যক্তির হস্তে তৃণ দিয়া গো সকলের সম্মুখে তাহা ধরিলেন; তাহারা সকলে উহা গ্রাস করিতে লাগিল। ইহার পর তুলসীদাস পরীক্ষার্থীর হস্তে এক থাল অন্ন দিয়া উহা নন্দীর সম্মুখে রক্ষা করাইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্ দেবদেব! রামনামের মাহাত্ম্য আপনি বই আর কে বুঝিবে? এই সমস্ত অল্পবিশ্বাসীর মনের সন্দেহ আপনি দূর করিয়া দিন। যদি এ ব্যক্তি নিষ্পাপ হইয়া

থাকে, তাহা হইলে ইহার হস্তের অন্ন নন্দীবৃষ গ্রহণ করুন।” কথিত আছে, এই কথা বলিবামাত্র পাষাণময়ী নন্দীমূর্ত্তি আশ্চর্য্য এক জীবিত বৃষের আকার ধারণ করিয়া সকল অন্নগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া, সকল লোকের মনে নামের মাহাত্ম্য মুদ্রিত হইয়া গেল এবং সকলে তুলসীদাসকে ধন্য ধন্য করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিল। উক্ত পাপমুক্ত মনুষ্যও আপনার গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

কোন সময়ে, এক তস্কর তুলসীদাসের গৃহে চুরি করিতে আসিয়াছিল। সে সিঁদ কাটিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, অতি অনুপম, শ্যামবর্ণ, জনমনোমোহন এক পুরুষ ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এইরূপ দেখিয়া চোর সে রাত্রে পলায়ন করিল। তাহার পর, তিন চারি দিবস রাত্রিকালে দ্রব্যাদি অপহরণ করিবার মানসে ঐ ব্যক্তি গোঁসাইজীর গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু যত বার যায়, সেই শ্যামবর্ণ প্রহরীকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া পলাইয়া আসিতে হয়। অবশেষে, এক দিন প্রাতঃকালে, ঐ চোর নির্ভয়চিত্তে তুলসীদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, “মহারাজ! আপনার গৃহে যে নবদূর্ব্বাদলবিনিন্দিত শ্যামবর্ণ পুরুষ বাস করেন, তিনি আপনার কে? আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করি।” এই কথা শুনিয়া গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি তাঁহাকে কবে ও কোন্ সূত্রে দেখিয়াছ?” চোর সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে তুলসী বুঝিতে পারিলেন যে, শ্যামবর্ণ পুরুষ আর কেহ নহে—স্বীয় প্রভু রামচন্দ্র। ইহার পর, আপ-

নার কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় হইয়াছে বলিয়া ইষ্টদেবকে রাত্রি জাগরণ করিয়া উহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার কতই ক্লেশ হইয়া থাকে, এই ভাবিয়া তুলসীদাস সমস্ত সঞ্চিত দ্রব্য দীনদুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তাহাকেও কিয়দংশ লইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু সে তাহা লইল না, বরং আপনার যাহা ছিল সমস্ত বিতরণ করিয়া দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

এক দিন, কোন ব্রাহ্মণীর পতির মৃত্যু হওয়াতে, উহার সৎকার করিবার নিমিত্ত তিনি গঙ্গাতীরে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তুলসীদাসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তুলসী "দীর্ঘজীবিনী ও সৌভাগ্যবতী হইয়া পতি-সেবা কর", এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই কথা শুনিয়া, উহাঁর সঙ্গে যে সমস্ত লোক জন ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, "গোসাইজী! এ কি আশীর্ব্বাদ করিলেন? এই স্ত্রীলোকটীর স্বামী যে অদ্যই মরিয়াছেন এবং ইনি তাঁহার দাহাদি কার্য্য করিতে গঙ্গাতীরে যাইতেছেন। আপনার তপোবল ও বাক্যনিষ্ঠার বিষয় সকলেই অবগত আছে, কিন্তু এস্থলে আপনার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া?" এই সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিয়া তুলসী কিঞ্চিৎ কাল স্তিমিত-লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, যতক্ষণ আমি শ্মসান ভূমিতে উপস্থিত না হই, এই স্ত্রীর মৃত স্বামীর দেহ দগ্ধ করিও না।"

অনন্তর, তুলসীদাস স্বয়ং শ্মসানভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের মৃতদেহটী গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া এবং উহাকে

উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া, উহার পার্শ্বে বসিয়া নিমীলিত-লোচনে ব্রহ্মরূপী রামনাম জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রায় এক প্রহর কাল ঈশ্বরস্তুতি ও প্রার্থনা করিলে পর, ঐ মৃত ব্যক্তি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সকলের সম্মুখে উঠিয়া বসিল, ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আমি এখানে কি প্রকারে আসিলাম?" অনন্তর, উহার আত্মীয় স্বজন সকলে কহিতে লাগিল যে, "তোমার মৃত্যু হইয়াছিল, গোঁসাইজী তোমার প্রাণ দান করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া, ঐ ব্যক্তি তুলসী-দাসের চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সেখানকার সমস্ত লোক বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তারকব্রহ্ম রামনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় ভবনে চলিয়া গেল।

মহাত্মা তুলসীদাসের সম্বন্ধে এইরূপ অনেকানেক অলৌকিক আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়া থাকে। এক সময়, তাঁহার এই সমস্ত আশ্চর্য্য তপোবলের কথা শ্রবণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যান এবং কিছু আশ্চর্য্য দৈবশক্তির পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে তুলসীদাস বাদশাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি সামান্য মনুষ্য, কোনরূপ অলৌ-কিক কার্য্য করিতে আমার সামর্থ্য নাই।" এই কথা শুনিয়া আপনাকে উপেক্ষিত বিবেচনা করিয়া বাদশাহ তুলসীকে কারা-রুদ্ধ করেন। কিন্তু ভগবানের বিশেষ দয়া প্রভাবে তিনি অলৌ-কিক উপায়দ্বারা তথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

দিল্লী হইতে গোঁসাইজী বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং তথায় ভক্তমালরচয়িতা বৈষ্ণবচূড়ামণি নাভাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ

হয়। নাভাজী তাঁহার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়া স্বরচিত কবিতা-গুলি তাঁহাকে পড়িয়া শ্রবণ করান।

এক দিন তুলসীদাস বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে গোপালজী নামক বিগ্রহ দর্শন করিতে যান। তথায় ধর্ম্মাভিমানী কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিগ্রহ দর্শন করিতে গমন করে, সে অতি নীচমনা ও অসার মনুষ্য। এই কথা শুনিয়া তুলসী দেবমূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন ;—

কা বরংহুঁ ছবি আজকী, ভলে বিরাজো নাথ ;
তুলসী মস্তক তব নওয়ে, ধনুষবাণ লেঁ্যা হাত।

অস্যার্থ।

আজিকার রূপ কিবা বর্ণিবারে পারি,
বিরাজ করিছ নাথ ভাল বলিহারি।
তুলসী মস্তক কিন্তু নত হয় তবে,
ধনুর্ব্বাণ করেতে গ্রহণ কর যবে।

কথিত আছে যে, তুলসীদাস এই কথাগুলি, বলিতে না বলিতে, শ্রীগোপালজীর হস্তস্থিত বংশী ধনুর্ব্বাণে পরিণত হইয়া গেল! সমবেত লোক সমূহ দেখিয়া অবাক্। হরিভক্তবিদ্বেষী পাষণ্ডের মুখ লজ্জায় অবনত হইল।

এইরূপ চমৎকার ভগবল্লীলা প্রচার ও দেবদেবী দর্শন করিয়া, গোঁসাইজী বৃন্দাবন হইতে কাশিতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথায় হরিভজন, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থপ্রণয়ন কার্য্যে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

সংবৎ ষোলহ শৌ অসী, অসী গঙ্গকে তীর;
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তুলসী ত্যজো শরীর।

অস্যার্থ।

সম্বং ষোল শ আশি, অসী গঙ্গাতীর,
শ্রাবণ সপ্তমী শুক্লে (তুলসী) ত্যজিলা শরীর।

ভক্তকবি তুকারাম।

পুনানগর হইতে ৭।৮ ক্রোশ পশ্চিমে দেহুনামে একটী গ্রাম আছে। তথায় বাল্‌হোজী নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। এই বাল্‌হোজীর দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম সাবাজী এবং কনিষ্ঠের নাম তুকারাম। তুকারাম ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে শূদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাঁর পূর্ব্ব-পুরুষগণ অতীব নিরীহ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। বিট্রোবা নামে দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ ইহাঁদের বংশের উপাস্য দেবতা ছিলেন।

বাল্‌হোজী শস্যক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর স্বীয় কার্য্য ভার সমর্পণ করিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত হইতে বাসনা করেন। কিন্তু সাবাজীর পারমার্থিক বিষয়ে অতিশয় আগ্রহ ছিল, সাংসারিক ব্যাপারে কিছুমাত্র মনোনিবেশ হইত না। এই জন্য বল্‌হোজীর বিষয়কর্ম্ম পরিদর্শনের ভার ১৩ বৎসর বয়সেই তুকারামের উপর ন্যস্ত হয়।

কএক বৎসর তুকারাম আগ্রহের সহিত পিতার ব্যবসায় ও বিষয়কর্ম্ম চালাইয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন তিনি সাংসারিক কর্য্যে অনুরক্ত থাকিতে পারেন নাই। বিংশতি বৎসর বয়ক্রমে তুকারাম বিবিধ প্রকার কষ্টে পতিত হন। তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। এই সময়, এক স্ত্রী ও পিতার মৃত্যু হয় এবং একটী

পুত্র সন্তানও ইহলোক পরিত্যাগ করে। এদিকে, ব্যবসায়েরও বিশেষ অবনতি সংঘটিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও এককালে নিঃস্ব করিয়া ফেলে। ইহার উপর আবার জিজাবাই নাম্নী তাঁহার জীবিতা স্ত্রী তাঁহাকে অতিশয় নির্যাতন করিতে আরম্ভ করেন। জীজাবাই অতিশয় ক্রোধন-স্বভাবা ও নীচমনা রমণী ছিলেন। কষ্টের সময় তিনি স্বীয় স্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিতেন। এই সময়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ যাত্রা করিলেন ও দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া, তুকারাম কেবল বিট্টোবা দেবের পূজায় ও তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে কতিপয় প্রতিবাসী তাঁহার সহিত যোগদান করিতেন। তুকারাম অতি সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় দীনতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও না করিয়া দরিদ্রদিগকে অকাতরে অন্নদান করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইতেন। এমন কি, তুকারাম ক্ষুধিত লোকদিগকে যে ভিক্ষা দান করিতে যাইতেছেন, নিষ্ঠুরা রমণী তাঁহার হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইত এবং অতীব কটুবচন প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিত। বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্র হইয়া স্বামী ভজন গান করিতেন বলিয়া জীজাবাই তৎপ্রতি অতিশয় বিদ্বেশ প্রকাশ করিত ও সময়ে সময়ে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে অবমাননা করিতেও ক্রটী করিত না। এই দুষ্টা স্ত্রী তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বামীর ব্যবসায়াদি বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহের পথে কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিত এবং সর্ব্বদাই বলিত

যে সেই সমস্ত অকর্ম্মণ্য লোক তুকারামকে কুপথে পরিচালিত করে। এইরূপ দুঃখের অবস্থায় তুকারাম স্বীয় স্ত্রীর নিকট সান্ত্বনা লাভ না করিয়া সবান্ধবে অবমানিত হইতেন।

অবশেষে জিজাবাইয়ের নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া সাধু তুকারাম গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বগ্রামস্থিত বিট্ঠোবা-দেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি এককালে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করেন নাই; সময়ে সময়ে, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। বিট্ঠোবাদেবের মন্দির হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে একটী পর্ব্বত আছে। তুকারাম তথায় গমন করিয়া ভজনসাধন ও ধ্যানধারণায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতেন এবং সন্ধ্যাকালে তথা হইতে দেবমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই সময়, বাবা চৈতন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই চৈতন্য নদীয়ার অবতার নহেন, উক্ত নামধারী তাঁহার একজন শিষ্য মাত্র ছিলেন। তুকারামের ধর্ম্মানুরাগ ও সংকীর্ত্তনাদি কার্য্যে অদম্য উৎসাহ দেখিয়া বাবা অতিশয় প্রীত হন ও নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সদয়বচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন।

বাবা চৈতন্যের উপদেশে তুকারামের জ্ঞান চক্ষুঃ বিশেষরূপে উন্মীলিত হইল এবং তিনি যেন এক নূতন জীবন লাভ করিলেন। ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন দ্বারা যে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, তুকারাম এক্ষণে তাহা বিশদ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এতকাল তিনি কেবল আপনাকে লইয়াই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; এক্ষণে সাধারণ মানবমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের উদয় হইল। এই সময় হইতে তিনি কথকতা করিতে ও ভজন গাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

তুকারাম প্রথমতঃ নামদেব গোস্বামীর বিরচিত আভাঙ্গা (ভজন) সকল গান করিতেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে ভগবানের কৃপায় তাঁহার হৃদয় কবিত্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং সহজ কথাবার্ত্তার ন্যায় অতীব অনুপম আভাঙ্গা সকল স্বয়ং মুখে মুখে রচনা করিতে লাগিলেন। এই সকল ভজন এরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সুমিষ্ট ও কবিত্বময় যে ইহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিপ্রেমে বিগলিত হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যেখানে সেখানে লোকে তুকারামের আভাঙ্গা গান করিয়া থাকে।

তুকারাম যে বিশেষরূপ লেখা পড়া জানিতেন, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ক্রমে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়ায় বোধ হয় যে,তিনি অপরাপর পণ্যজীবীদিগের ন্যায় সামান্য হিসাব পত্র ছাড়া আর কিছু শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,তাঁহার আভাঙ্গাতে বেদ ও পুরাণের কূট মত সকল অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাধু তুকারাম যখন গান করিতেন, তখন এরূপ ভবোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিতেন যে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্ব জাতীয় শত শত নর নারী একত্রিত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান থাকিত। ক্রমশঃ লোকে তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত পবিত্র গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিল। শূদ্রজাতীয় বলিয়া আর কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ ও সাধুর ন্যায় সকলে ভক্তি করিতে আরম্ভ করিল।

ভক্তকবি বলিয়া তুকারামের নাম এক্ষণে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্ম পিপাসুগণ দলে দলে উপদেশ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিলেন। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ অতীব ক্ষুব্ধ হইতে

লাগিলেন। তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মানাদি একজন শূদ্রে পাইতে লাগিল ইহা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। অতএব সকলে একমত হইয়া তাঁহাকে নির্যাতন করিবার পরামর্শ করিলেন। এই সূত্রে তুকারামের প্রথম পরীক্ষা এরূপ ব্যক্তির পক্ষ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল যে, তিনি তৎকর্ত্তৃক কোন অত্যাচার প্রাপ্ত হইতে পারেন, এরূপ মনে করেন নাই। দেহু গ্রামে মাম্বোজী নামক একজন গোস্বামী বাস করিতেন। তিনি তুকারামের ভজন সঙ্গীতে নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন এবং সাধু তুকারাম ও তাঁহাকে সরল ভক্ত ও প্রকৃত বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিট্ঠোবাদেবের মন্দিরের নিকট গোস্বামী মহাশয়ের একটী উদ্যান ছিল। ঘটনাক্রমে উদ্যানের বেড়ার কাঁটাগাছ গুলির শাখা প্রশাখা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, মন্দিরে যাইবার পথ বন্দ হইয়া গিয়াছিল। এই সময়, মন্দিরে কোন উৎসবের দিন নিকট হওয়ায় লোক জন বিনা ক্লেশে তথায় গমনাগমন করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তুকারাম পথের উপরে পতিত জঙ্গল গুলি কাটিতে আরম্ভ করেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া, মাম্বোজী সাতিশয় ক্রোধ পরবশ হইয়া তৎস্থানে আগমন করেন ও নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে কণ্টকশাখাদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করেন। সাধু তুকারাম কিন্তু ইহাতে কোন কথাই বলেন নাই। ভগবদ্ভক্তোচিত ধৈর্য্যের সহিত এই নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তুকারাম কএকটী আভাঙ্গা রচনা করেন। উহার মধ্যে একটীতে এই পরীক্ষা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিট্ঠোবা দেবকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছেন, "অন্তরে ক্ষমা দান করিয়া বাহ্য দেহকে ইষ্ট-

দেব কষ্ট সহ্য করাইয়াছেন। ইহার অপেক্ষা দয়ার চিহ্ন আর অধিক কি হইবে?" এই পরীক্ষার পর পূর্ব্বের ন্যায় তুকারাম প্রতিদিন নিয়মিতরূপে মন্দিরে ভজনগান করিতে লাগিলেন। তিনি এই ব্যবহারের জন্য মাম্বোজীর প্রতি কখনই অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু কথিত আছে যে, তুকারামের এই অসাধারণ ক্ষমাগুণে মোহিত হইয়া মাম্বোজী পরে সাতিশয় অনুতপ্ত হন এবং অবশেষে সাধুর শিষ্য ও সেবক হইয়া স্বকীয় কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

অনন্তর ভক্ত তুকারামকে ইহা হইতেও অধিকতর কষ্টকর অপর একটী পরীক্ষার অধীন হইতে হইয়াছিল। ভগোলী নিবাসী রামেশ্বর ভট্ট নামক এক ব্যক্তি, সাধুর প্রবর্দ্ধমান যশঃ-সৌরভে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার অনিষ্টাচরণে কৃতসংকল্প হইলেন। এই অভি-প্রায় সাধন করিবার জন্য তিনি একটী বিষম চক্র করিয়াছিলেন। এই পরহিংসাকারী ব্রাহ্মণ প্রাদেশিক বিচারপতির নিকট এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, তুকারাম নিরক্ষর শূদ্রজাতীয় হইয়া বিধর্ম্ম প্রচার করিতেছে এবং তাহাকে ইহা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত না করিলে দেশের মহা অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। বিচারক তুকারাম কর্তৃক প্রজাকুলের অভ্যুত্থান হইতে পারে, এই ভয়ে দেহুর পাটিয়ালকে আজ্ঞা করেন যে তিনি তাঁহাকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। এই ঘটনায় তুকারাম অতীব নিরাশ হইয়া পড়েন এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের করুণার প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হইয়া যায়। তিনি অতি দীনভাবে রামেশ্বর ভট্টের নিকট গমন করিয়া রাজাজ্ঞা প্রতি-হারের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। ভট্টজী বলিলেন, "যদি তুমি

আর আভাঙ্গা বিরচন না কর এবং যে গুলি করিয়াছ তাহার সমস্ত জলে ফেলিয়া দেও, তাহা হইলে আমি বিচারপতির আজ্ঞার প্রতিহরণ করাইয়া দিতে পারি।” কথিত আছে যে, তুকারাম এই অনুচিত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বরচিত আভাঙ্গা গুলি জলে ভিজিয়া নষ্ট না হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ করিয়া ঐ অমূল্যরত্ন গুলিকে নদীজলে বিসর্জ্জন করেন। লোকে তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল, “এ ব্যক্তি কি মূর্খ! কিছু দিন পূর্ব্বে এ আপনার দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি সাংসারিক অধিকারবিষয়ক কাগজপত্র জলে ফেলিয়া দিয়া ইহ-কালের সুখের আশা নষ্ট করিয়াছে, আবার অদ্য স্বরচিত ভক্তি-পূর্ণ কবিতাগুলি বিসর্জ্জন করিয়া পরলোকের সুখের আশাতেও আপনাকে বঞ্চিত করিল।

লোকের এইরূপ তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু তুকারাম অতিশয় মর্ম্মব্যথা প্রাপ্ত হইলেন ও স্বীয় নিন্দিত কার্য্যের নিমিত্ত নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া বিট্টোবার নিকট সাশ্রুনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাবৎকাল বিট্টোবাদেব তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ না করিয়াছিলেন, সেই অবধি তিনি ভোজন পান পরিত্যাগ করিয়া মন্দির-দ্বারে ধর্ণা দিয়া পড়িয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, এইরূপ অবস্থায় তিনি ত্রয়োদশ দিন পর্য্যন্ত বিট্টোবার দ্বারে পতিত ছিলেন। অবশেষে, ইষ্টদেব প্রসন্ন হইয়া রাত্রিকালে বালকের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভয় নাই; আভাঙ্গা গুলি নষ্ট হয় নাই। অমুক স্থানে গিয়া সে গুলিকে জল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লও।” এইরূপে তুকারাম পূর্ব্ববিরচিত আভাঙ্গাগুলির

উদ্ধার সাধন করিয়া, ইষ্টদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ জাতীয় নূতন নূতন ভজন বিরচিত করেন। অবশেষে রামেশ্বরের চিত্ত এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তখন শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া তিনি তুকারামের বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া পড়িলেন। এই রামেশ্বর ভট্ট ভক্ত চূড়ামণি তুকারামের চতুর্দ্দশ শিষ্যের মধ্যে একজন। ভট্টজীর চিত্তপরিবর্ত্তনের এইরূপ অলৌকিক আখ্যায়িকা কথিত হইয়া থাকে। ইহার উপর কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে, পাঠকগণ তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া লইবেন।

ভক্ত তুকারামের জিতেন্দ্রিয়তার বিষয় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী উদ্ধৃত করা গেল। কোন এক অতীব সুন্দরী স্ত্রী প্রত্যহ তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিতে যাইত। তুকারামের রূপগুণে বিমোহিত হইয়া সে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়া পড়ে। এক দিবস সাধুকে একাকী পাইয়া জ্ঞানহীনা রমণী তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তুকারাম এই ব্যাপারে অতীব ব্যথিত চিত্ত হইয়া রমণীকে উত্তর করিলেন যে, তাঁহার স্বীয় ভার্য্যা ভিন্ন অপর কামিণী তাঁহার পক্ষে রুক্মিণী দেবী। তিনি তাঁহার জননী-তুল্যা। আর যেন সেরূপ কদর্য্য কথা উচ্চারণ না করেন।

লোহাগাঁও নামক জনপদে শিবজী নামক এক কাংসবণিক বাস করিতেন। তাঁহার সহিত তুকারামের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই ব্যক্তি স্বীয় সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তুকারামের সহিত অনেক সময় যাপন করিতেন। স্বামীর এইরূপ আচরণ দেখিয়া বণিকপত্নী সাধুর উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। কোনও প্রকারে তাঁহাকে নির্যাতন করিয়া স্বামীর সঙ্গ ছাড়াইতে

হইবে, এইরূপ মনে করিয়া সে এক দিবস স্বীয় ভবনে সাধু তুকারামকে নিমন্ত্রণ করিল। অনন্তর আহারের পূর্ব্বে তুকারাম উষ্ণজলে স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, দুষ্টা রমণী তাঁহার মস্তকে অগ্নিতুল্য অত্যুষ্ণ জল ঢালিয়া দেয়। ইহাতে সাধুর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। সাধু তুকারাম বণিক রমণীর এই অসদ্ব্যবহারে নিরতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে কোন কথাই বলেন নাই; কেবল যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা দানের জন্য বিট্টোবা দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভক্তচূড়ামণি তুকার এই প্রকার সহিষ্ণুতা দর্শন করিয়া শিবজ্জী-বণিতার পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায় এবং কথিত আছে যে, সে এই নৃশংস কার্য্যের জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করে।

তুকারাম সামান্য শূদ্র হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে এতাধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া দুইজন সন্ন্যাসী স্বীয় স্বীয় জীবনের পবিত্রতা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা মহারাজ শিবজীর প্রধান কর্ম্মচারী দাদোজী খণ্ডদেবের নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া পবিত্র বেদার্থ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। এই কার্য্য নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ, সুতরাং তুকাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়া এই অনধিকারচর্চ্চা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীদিগের এই বাক্যে বুদ্ধিমান্ দাদোজী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদিগকে তুকারামের সহিত ধর্ম্মবিষয় লইয়া বিচার করিতে হইবে। অতঃপর যে পক্ষ পরাজিত হইবে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

জ্ঞানাভিমানী সন্ন্যাসীদ্বয় উল্লিখিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিয়া জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজাজ্ঞায় পণ্ডিতমণ্ডলীর এক বিরাট সভা সমাহূত হইল। শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দাদোজী তুকারামকে সঙ্কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। তুকাও বিশেষ আগ্রহ ও ভক্তির সহিত স্বরচিত আভাঙ্গা সকল গান করিতে লাগিলেন। সমবেত পণ্ডিতগণ ও অপরাপর লোকসমূহ এককালে বিমোহিত হইয়া, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয় ও আপনাদের বিদ্বেষভাব ভুলিয়া গিয়া গদগদ চিত্তে ভক্তির সহিত তুকার চরণে প্রণাম করিলেন। এই সমস্ত দর্শন করিয়া দাদোজী বিমোহিত হইয়া গেলেন। তিনি সন্ন্যাসীদ্বয়কে যথোচিত তিরস্কার করিয়া, তাঁহাদের পরাজয় ও সাধু তুকারামের জয় ঘোষণা করিয়া দিলেন।

উল্লিখিত পরীক্ষার পর আর তুকারামকে অধিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার বিজয়পতাকা এই সময় হইতে অনুকুল বায়ু পাইয়া সতেজে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহার শত্রুকুল তৎপ্রতি যে সমস্ত বাণ বর্ষণ করিয়াছিল, সমস্তই প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া তাহাদিগকেই আহত করিতে লাগিল। মেঘাবসানে সূর্য্যকিরণের ন্যায় তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে পরিবর্দ্ধিত উজ্জলতার সহিত বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

তুকারামের জীবনের শেষ অবস্থার পরিষ্কার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, নদিয়ার গৌরচন্দ্রের ন্যায়, তিনি সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে যে, তিনি স্বশরীরে অমরধামে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি কাহাকেও না বলিয়া তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তি আছে যে, যাইবার পূর্ব্বে, তিনি স্বীয় সহ-

ধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমার সহিত স্বর্গযাত্রা করিবে?" কিন্তু স্বর্গ, ঈশ্বরসান্নিধ্য-উপভোগ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তুকারাম যদি সংসারের নিকট বিদায় লইয়া একান্তে কেবলমাত্র ঈশ্বর ধ্যান ও যোগানন্দে কালযাপন করিতে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি স্বর্গে যাইতেছিলেন, একথা বলিবার আর বাধা কি?

সাধু তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিবার পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত যে, তিনি কিরূপ স্বভাবের লোক ছিলেন এবং তাঁহার মহত্ত্ব কোথা হইতে আসিয়াছিল। তিনি জাতিতে শূদ্র, ব্যবসায়ে সামান্য পণ্যজীবী, গ্রামবাসী ও নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহার ধনসম্পত্তি কিছুই ছিল না, কিন্তু তাঁহাতে এমন কিছু ছিল, যাহার প্রভাবে ধনী, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান সকলে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহার পদানত হইতেন। আসল কথা, তুকারাম আপনার আত্মাকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ও বশীভূত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি সাংসারিক কষ্টকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। যৎকালে মাম্বোজী তাঁহাকে কণ্টকাকুলিত যষ্টিদ্বারা প্রহার করেন, যে সময় কাংসবণিক শিবজীর স্ত্রী উত্তপ্ত সলিল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দেয়, যখন ব্যবসায়ে তাঁহার সর্ব্বস্ব ক্ষতি হইয়া যায়, এবং তাঁহার পিতা, পুত্র ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তুকারামের সেই সময়ের অবস্থা স্মরণ করিলে কার না চক্ষে জল আইসে? অথচ, তিনি তাহার কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। বীরপুরুষের ন্যায় অনায়াসে সকলই ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতা ও চিত্তের প্রশান্তভাব, সাম্য ও সংযতাবস্থাই তুকারামের চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ ও তাঁহার

মহত্ত্ব লাভের প্রধান উপাদান ছিল। দুরবস্থার সময়, তুকারাম কেবল বিট্ঠোবাদেবের নাম জপ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখিতেন, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। যখন তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া, তিনি দৈন্যাবস্থায় কালযাপন করেন, তখন যতই নীচকর্ম্ম হউক না কেন, তাহার অবলম্বনে বৈধ অর্থোপার্জ্জনদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এক সময়, তাঁহাকে শস্য ক্ষেত্রের প্রহরীর কার্য্য করিয়া স্বীয় ও পরিবারবর্গের উদরান্ন আহরণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থাতেও তিনি অপর মনুষ্যের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি অতিশয় দাতা ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় এককালে বিগলিত হইয়া যাইত। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়াও অপরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে ত্রুটী করিতেন না। এই স্বভাবের নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রী জীজার নিকট তাঁহাকে সামান্য নির্যাতন সহ্য করিতে হইত না। এক সময়ে, তিনি কতিপয় ইক্ষুদণ্ড একত্র বন্ধন করিয়া গৃহে আনিতে ছিলেন। পথের মধ্যে, একজন পিপাসিত দুঃখী লোককে দেখিয়া তাহার এক গাছি তাহাকে দিলেন। আবার কিছুদূর যাইতে না যাইতে, অপর একজন ভিক্ষুক আর এক দণ্ড প্রার্থনা করিল ; তুকারাম তাহাকেও বঞ্চিত করিলেন না। এইরূপ করিতে করিতে যখন তিনি গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হস্তে একগাছি মাত্র ইক্ষু অবশিষ্ট ছিল। তাঁহার স্ত্রী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতীব ক্রোধভরে তাঁহাকে নানা প্রকার কটুবাক্যে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ রমণী তুকারামের হস্ত হইতে অবশিষ্ট ইক্ষুদণ্ড

গ্রহণ করিয়া সজোরে ভর্ত্তার পৃষ্ঠদেশে তদ্দ্বারা আঘাত করিল। ইক্ষুদণ্ড ইহাতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু তুকারাম জীজার, এই ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বাহ! তুমি বেশ গৃহিণীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তুমি যথার্থই আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী। তুমি ইক্ষুদণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, এখন আইস, এক এক খণ্ড করিয়া আমরা উভয়ে উহা ভক্ষণ করি।"

ধর্ম্মজীবনে প্রাণিত মহাত্মাগণ কখনও সাংসারিক দুঃখে অবসন্ন হন না। বরং দুঃখ, দরিদ্রতা, রোগ, শোক ও বিপদাদিতে মনুষ্যকে ঈশ্বরের সমীপে আকর্ষণ করে, এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এই গুলিকে সকল সুখের মূল বলিয়া বিবেচনা করেন। তুকারাম, দুঃখের সময় বিট্টোবার মন্দিরে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া একটী আভাঙ্গায় এইরূপে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেনঃ—' হে প্রভো! সাংসারিক ক্লেশে সময়ে সময়ে পতিত হই, ইহা আমার পক্ষে মঙ্গলকর; আমার সর্ব্বস্ব ক্ষতি হইয়া ভাল হইয়াছে, শোকে আমার উপকার করিয়াছে; আমার স্ত্রীর সুতীব্র ভৎসনা-বাণীও আমার মঙ্গলের জন্য; কেননা এ সকল আমাকে তোমার নিকট আনয়ন করে ও আমি প্রকৃত সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই।"

ধর্ম্মবীর মহাপুরুষেরা পৃথিবীর ধনকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এক সময়, মহারাজ শিবজী তুকারামকে স্বীয় রাজভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু পাছে সাংসারিক বিভব দর্শন করিয়া চিত্তের মলিনতা জন্মে, এই ভয়ে, তিনি তথায় গমন করিতে অস্বীকার করেন। একটী অভাঙ্গায়, তিনি শিবজীকে উদ্দেশ

করিয়া এই কথা বলিয়াছেনঃ—"আমরা দুঃখী নহি, দাতব্য বা কৃপার পাত্র আমাদিগকে কোনরূপেই বিবেচনা করিবেন না। মহারাজাধিরাজ পাণ্ডুরঙ্গ (কৃষ্ণ) আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। আমরা কেন অপরের অপেক্ষা করিব? আমাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই সামান্য—আপনার নিকট আমাদের প্রয়োজন কি?" অপর এক স্থলে বলিয়াছেন "যাহাদের অসার ধন ও সাংসারিক প্রতিপত্তিতে প্রয়োজন, তাহারাই রাজভবনে গমন করে। আমার কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, যে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার আমায় জীবনহীন করে। আঁমার কিসের অভাব? সুবিস্তৃত পৃথিবী আমার শয্যা, অনন্ত আকাশ আমার আচ্ছাদন।"

ভক্ত তুকারামের জীবন অতীব পবিত্র ছিল। অতি অল্প লোকেই মনোমোহিনী সুন্দরী কামিনীর রূপভোগের প্রলোভন জয় করিতে পারে। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অতীব পবিত্রমনা ঋষি তপস্বীরাও সময়ে সময়ে রূপবতী রমণীর কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া ধর্ম্মমার্গ হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন। এরূপ পরীক্ষায় কিন্তু তুকারাম বিজয়ী বীরপুরুষের ন্যায় উত্তীর্ণ হইয়া সমস্ত জগৎকে প্রকৃত সাধুজীবনের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

নিষ্কলঙ্ক জীবনের আদর্শ স্বরূপ তুকারাম বহুসংখ্যক আভাঙ্গা নামক ভজন প্রণয়ন করিয়া পৃথিবীতে স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন। এ গুলি এখন পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের রাজ প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে সমান আগ্রহ ও ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণশূদ্র সকলেই ইহা হইতে অমিশ্র

আনন্দ উপভোগ করেন। সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত এই আভাঙ্গাগুলি আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা সমাজে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

সম্পূর্ণ।

আনন্দ উপভোগ করেন। সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের পূর্ব্বে রচিত এই আভাঙ্গাগুলি আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দেশের ব্রাহ্ম ও প্রার্থনা সমাজে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

সম্পূর্ণ।